Contents

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ '৯৯

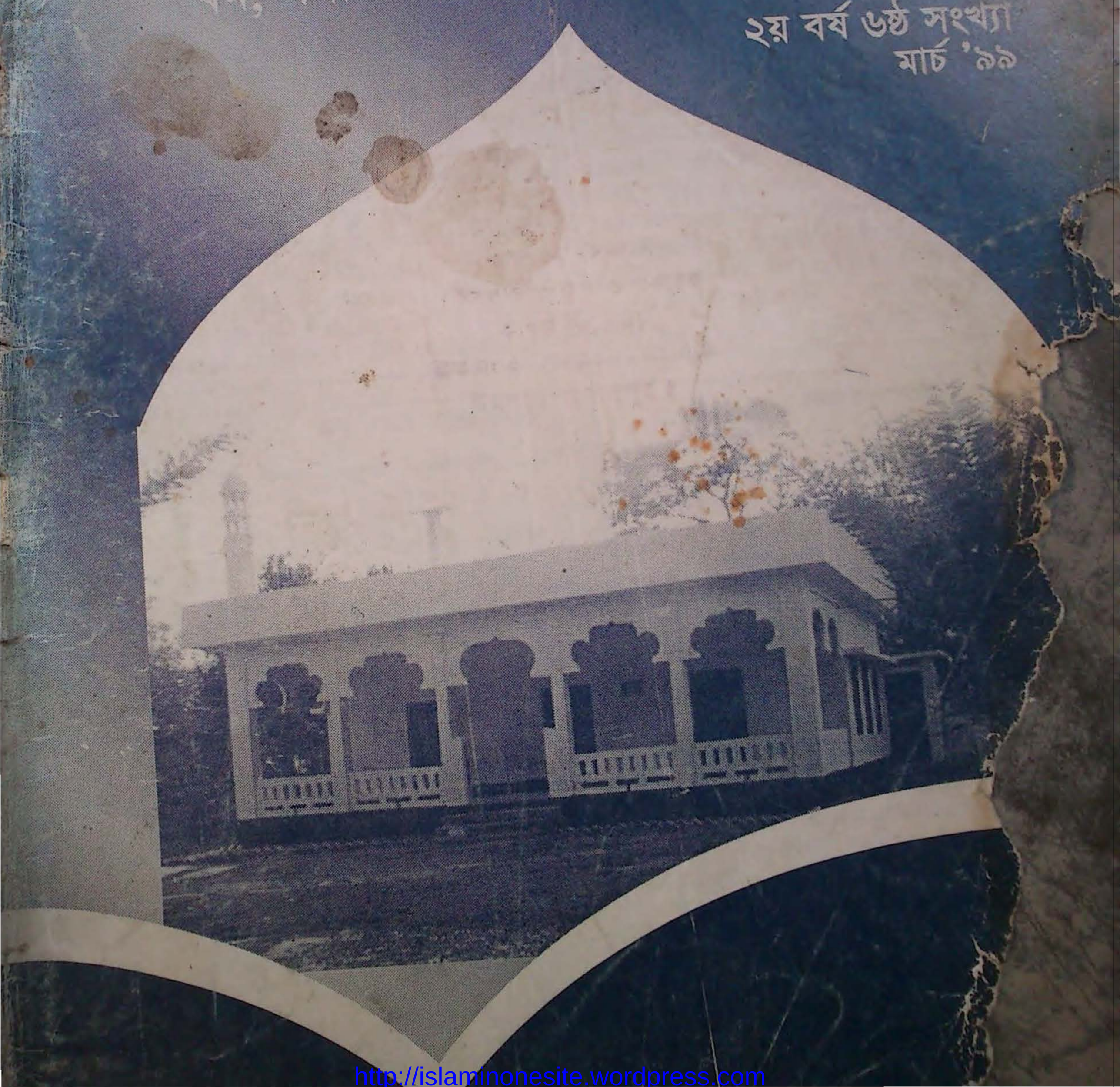

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

২য় বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
যিলক্বদ ১৪১৯ হিঃ
ফাল্গুন ১৪০৫ বাং
মার্চ ১৯৯৯ ইং

প্রধান সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ওয়ালিউয্ যামান

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ
নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোন- (০৭২১) ৭৬০৫২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
ঢাকা ফোনঃ ৮৯৬৭৯২,৯৩৩৮৮৫৯

মূল্যঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ২
- দরসে কুরআন ৩
- দরসে হাদীছ ৯
- প্রবন্ধ ঃ
  - আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি ১২
    -অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী
  - আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ১৫
    - অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ
  - ঈদে কুরবান ও আমাদের করণীয় ১৮
    -এস, এম, আব্দুল লতীফ
  - মওযূ ও যঈফ হাদীছের প্রচলন ২২
    -ভাষান্তরঃ আব্দুর রাযযাক
- ছাহাবা চরিতঃ
  - হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ২৫
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- কবিতা ৩০
  হাম্দ -আব্দুল ওয়াকীল
  লক্ষ্য মোদের -মোল্লা আব্দুল মাজেদ
- সোনামণিদের পাতা ৩০
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৩
- মুসলিম জাহান ৩৬
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৩৭
- সাময়িক প্রসঙ্গ ৩৮
- সংগঠন সংবাদ ৪২
- পাঠকের মতামত ৪৯
- টক-ঝাল-মিষ্টি ৫০
- প্রশ্নোত্তর ৫১

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পাদকীয়

ত্যাগের সুমহান আদর্শ নিয়ে ঈদুল আযহা সমাগতঃ

ঈদুল আযহা সমাগত। ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার আহবানের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে মহান ঈদুল আযহা। ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে বিশ্ব মুসলিম জনগোষ্ঠীকে। ত্যাগ এবং ভোগ উভয়ই জড়িয়ে আছে ঈদুল আযহার সাথে। ভোগের আনন্দ ক্ষণিক। তৃপ্তি মিটে গেলেই এর যবনিকাপাত ঘটে। আর ত্যাগের আনন্দ সুদূর প্রসারী এবং মহিমান্বিত। ভোগের আনন্দ বাহ্যিক। দুনিয়াতেই সীমিত। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত। ইসলাম ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ও আল্লাহ্‌র জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ত্যাগ মানুষকে বিনয়ী, সহনশীল, সংযমী ও সর্বোপরি মানবতাবাদী হ'তে শিক্ষা দেয়। ঈদুল আযহা সে মহীয়ান ত্যাগেরই এক অনন্য উৎসব। মুসলিম উম্মাহ্‌র অন্যতম প্রধান আনন্দ উৎসব ঈদুল আযহা।

ঈদুল আযহার মূল আহবান হলো মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্য প্রকাশ। বিত্তের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মহব্বত সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করে দেওয়াই হলো ঈদুল আযহার মূল শিক্ষা।

বান্দা যখন সম্পূর্ণরূপে তার প্রভু আল্লাহ্‌র নিকটে নিজকে সমর্পণ করে, তখন আল্লাহ তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার ছিলেন এমনই এক আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের মূর্ত প্রতীক।

আল্লাহ্‌র প্রতি ইবরাহীমের আনুগত্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে। পিতার ছুরির নীচে কুরবানী হওয়ার জন্য শিশু বালক ইসমাঈলের গলা সমর্পণ ও নির্ভেজাল আনুগত্য আমাদের ব্যাকুল করে। শিহরিত করে প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে। একমাত্র আদরের পুত্র ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে নির্জন মরুভূমিতে আল্লাহ্‌র নিকটে সোপর্দ করে যখন বুকে পাষাণ বেঁধে ইবরাহীম ফিরে যাচ্ছেন, আর ব্যাকুলিত মনে হাজেরা পিছু পিছু এগুচ্ছেন আর বলছেন, ওহে স্বামী! আপনি এ বিরান ভূমিতে আমাদের কেন এভাবে ফেলে যাচ্ছেন? নির্বাক ইবরাহীম নিশ্চুপ! জওয়াব না পেয়ে হাজেরা ঈমানী শক্তিতে বলে উঠেন, আল্লাহ কি আপনাকে এ নির্দেশ দান করেছেন? অনেক কষ্টে ইবরাহীম শুধু বলেছিলেন, হ্যাঁ। ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে উঠেন হাজেরা। বলে উঠেন 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের ধ্বংস করবেন না'।

আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য তাঁর হুকুম মোতাবেক একমাত্র সন্তানকে নিজ হাতে যবহ করার কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তরণ- এ সবই ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি অটুট আনুগত্য, গভীর আল্লাহ প্রেম এবং নির্ভেজাল তাওহীদ ও তাক্বওয়ার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা মাত্র। পুত্রকে কুরবানী করে আল্লাহ্‌র আদেশই মান্য করেন ইবরাহীম। আল্লাহ্‌র ভালোবাসার চেয়ে পুত্রের ভালোবাসা গৌণ, এটিই প্রমাণ করেন তিনি। তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতির এর চেয়ে বড় উদাহরণ পৃথিবীর বুকে আর কি হ'তে পারে? ইবরাহীমের তাক্বওয়া ছিল আপোষহীন ও একনিষ্ঠ।

তৎকালীন পুঁতি গন্ধময় সমাজ ছিলো অন্যায় অত্যাচার আর নিষ্ঠুরতায় ভরপুর। শিরক আর অনৈতিকতায় সমাজ ভাসছিলো। এমনি সময়ে ইবরাহীমের এ আত্মত্যাগ ছিলো বৈপ্লবিক ঈমানী জাগরণ। সে জাগরণ রাজনৈতিক নয়, অর্থনৈতিক নয়। বরং নৈতিক এবং আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত। বর্তমানে আমরা এমন এক সমাজ দৃশ্যপটে দাঁড়িয়ে আছি, যা নমরূদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। দুর্নীতির পঙ্কে নিমজ্জিত আজ সমাজের প্রতিটি স্তর। ভোগ-বিলাসে মত্ত সবাই। মূল্যবোধ আজ বিসর্জিত। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে হানাহানি। দলে দলে সহিংস সংঘাত। গণতন্ত্রের নৈতিকতাহীন দলীয় রাজনীতির স্রোতে ইসলামী দল গুলোও আজ গা ভাসিয়ে দিয়েছে। এ অধঃপতিত সমাজকে টেনে তোলার জন্য চাই আজ ইবরাহীমী তাক্বওয়াশীল নেতৃত্ব ও ইসমাঈলী আনুগত্যশীল একদল আকুতোভয় ঈমানদার যুব জনগোষ্ঠী। ইবরাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী আত্মত্যাগের মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতে আমাদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর আগে নিজের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি চালাতে হবে। মানবিকতার উত্থান ঘটাতে হবে। ইসমাঈলী আত্মত্যাগের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পবিত্র ঈদুল আযহার এ শুভ ক্ষণে সত্যিকারের ঈমানদার ও তাক্বওয়াশীল এবং আপোষহীন সত্যসেবী হওয়ার জন্য আসুন আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করি।

ইবরাহীমী ত্যাগ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা যেন আমাদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারি। আল্লাহ্ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ী ও এজেন্ট ভাইদের ঈদের শুভেচ্ছা ও আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। ঈদে কুরবানের ত্যাগপূত অনাবিল আনন্দে আপনার জীবন ভরে উঠুক এ দো'আ করি-আমীন!!

http://islaminonesite.wordpress.com

দরসে কুরআন

ভাষা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِيْنَ -

১. **উচ্চারণঃ** ওয়া মিন আ-য়া-তিহী খাল্‌কুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরযি ওয়াখ্‌তিলা-ফে আলসিনাতিকুম ওয়া আল্‌ওয়া-নিকুম; ইন্না ফী যা-লিকা লাআ-য়াতিল লিল আ-লিমীনা।

২. **অনুবাদঃ** 'আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'ল আসমান ও যমীন সমূহ সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও রংয়ের বৈচিত্র সৃষ্টি করা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে' (রূম ২২)।

৩. শাব্দিক ব্যাখ্যাঃ

(১) **ওয়া মিন আ-য়া-তিহী** (وَمِنْ آيَاتِهِ)ঃ ওয়াও (واو) আত্বেফাহ, যা পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। মিন (من) 'হরফে জার'। যা পরবর্তী শব্দের শেষে যের দেয়। এখানে 'তাব্‌ঈন' (تبيين) বা ব্যাখ্যা অর্থে এসেছে। আ-য়া-তুন (آيات) অর্থ নিদর্শন সমূহ। একবচনে آية আ-য়াতুন। 'আয়াত' অর্থ আলামত বা নিদর্শন। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে পরবর্তী বাক্যের পার্থক্য বুঝানোর জন্য যে নিদর্শন ব্যবহার করা হয়, তাকে আয়াত বলা হয়। কেউ বলেন, 'আয়াত' অর্থ জামা'আত বা দল। কেননা এর মধ্যে কুরআনের একদল বর্ণসমষ্টি গ্রথিত থাকে। কেউ বলেন, আয়াত অর্থ বিস্ময়। কেননা কুরআনের বিস্ময়কর আয়াত সমূহের অনুরূপ বাক্য তৈরী করতে মানুষ ব্যর্থ হয়েছে।

ব্যাকরণবিদগণ آية শব্দের মূল ধাতু উদ্ধারে মতভেদ করেছেন। সীবাওয়ায়হে বলেন, এটি আসলে أَيَيَةٌ ছিল فَعَلَةٌ ওযনে। হরকত যুক্ত হওয়ার কারণে আলিফ-এ পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তার নিদর্শন হিসাবে প্রথম আলিফ -এর উপরে একটি 'মদ্দ' (آ) দেওয়া হয়। ফলে آية হয়ে যায়। কিসাঈ বলেন, এটি মূলে آيِيَةٌ ছিল فَاعِلَةٌ ওযনে। يَ হরকত যুক্ত হওয়ার কারণে আলিফ হয়ে যায়। অতঃপর দুই আলিফ একত্রিত হওয়ার কারণে দ্বিতীয় আলিফটি ফেলে দেওয়া হয়। ফার্রা বলেন, এটি মূলে أَيَّةٌ ছিল। প্রথম يَ টি তাশদীদ যুক্ত হওয়ার কারণে অপসন্দনীয় বিবেচিত হওয়ায় আলিফে পরিবর্তন করা হয়। ফলে آيَةٌ হয়ে যায়। বহুবচনে آيٌ , آيَاتٌ ও آيَاءٌ । তবে শেষের বহুবচনটি খুবই কম ব্যবহৃত হয়। অত্র আয়াতে বর্ণিত و من آياته অর্থ হবে و من علامات ربوبيته و وحدانيته 'আল্লাহ্‌র প্রতিপালন ও একত্বের নিদর্শন সমূহের মধ্যে অন্যতম হ'ল'...।

(২) **খাল্‌কুস সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরয** (خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ)ঃ 'আসমান ও যমীন সমূহ সৃষ্টি করা'। এখানে خَلْقٌ শব্দ ব্যবহার করার দু'টি কারণ রয়েছে।-

১. الخلق اى التقدير সৃষ্টি অর্থ পরিকল্পনা করা, ২. الخلق اى الإنشاء والاختراع والإبداع অর্থাৎ নতুন সৃষ্টি করা। خَلَقَ اى اخترعَ و أوجَدَ بعد العَدَمِ সে সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে এনেছে। এখানে দু'টি অর্থই প্রযোজ্য। যেমন সোনার খনি মাটির নীচে বহু পূর্বে আল্লাহ সৃষ্টি করে মওজুদ রেখেছেন। বহু পরে বান্দা সেটা আবিষ্কার করল। এর অর্থ এটা নয় যে, বান্দা সৃষ্টিকর্তা। বরং সে আবিষ্কর্তা। কিন্তু অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনা, ইতিপূর্বে যার কোন নমুনা ছিলনা- এটাকেই বলা হয় সৃষ্টি করা। এই সৃষ্টি বিনা পরিকল্পনায় এক্সিডেন্টালি হয়নি যেমন- নাস্তিকেরা বলে থাকে। বরং মহাপরিকল্পক আল্লাহ্‌র সুস্থির পরিকল্পনা মোতাবেক হয়েছে। ফলে আয়াতে বর্ণিত আসমান ও যমীনের সৃষ্টি করা অর্থ সৃষ্টির পরিকল্পনা করা। অতঃপর অনস্তিত্ব হ'তে অস্তিত্বে আনা দু'টিরই একক কর্তা আল্লাহ- এটা বুঝানো হয়েছে।

৩. **লিল আলিমীনা** (لِّلْعَالِمِيْنَ)ঃ 'জ্ঞানীদের জন্য'। عَالِمٌ এর অর্থ বিদ্বান। কিন্তু এখানে অর্থ করা হয়েছে 'জ্ঞানী'। এর কারণ বিদ্বান হ'লেই তবে জ্ঞানী হওয়া সহজ হয়। বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহ্ প্রদত্ত্ব জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়। বিদ্যা না থাকলে জ্ঞান এক সময় দিক হারিয়ে ফেলে। বিদ্যা ও জ্ঞান পরস্পরের পরিপূরক। বর্তমান যুগে ডিগ্রীকে বিদ্যা ও জ্ঞানের মাপকাঠি ধরা হয়। এটা সকল ক্ষেত্রে সঠিক না-ও হ'তে পারে। জ্ঞান আল্লাহ্‌র দেওয়া অমূল্য নে'আমত। বিদ্যা অর্জনের মাধ্যমে বান্দা সেই জ্ঞানকে

সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারে। পড়া ও লেখার মাধ্যমে সেই বিদ্যা অর্জিত হয়। সেজন্যই কুরআনের প্রথম 'অহি' হ'ল 'ইক্‌রা' (اِقْرَأْ) 'তুমি পড়'। এক সময় মুসলমান লেখাপড়ার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অসংখ্য নে'আমতের মালিক হয়ে বিশ্বের নেতৃত্ব দিয়েছিল। এখন তারা সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বস্তুবাদী চিন্তায় বিভোর হয়ে সেই নেতৃত্ব থেকে ছিটকে পড়েছে। আয়াতে 'জ্ঞানীদের' খাছ করার অর্থ এটা নয় যে, অন্যেরা কিছুই বুঝেনা। বরং জ্ঞানীরা যেহেতু সুক্ষ্মভাবে বুঝে ও তারাই বিশ্বের নেতৃত্ব দেয়; আবার তারাই বেশী বুঝতে গিয়ে নাস্তিক হয়, সে কারণ তাদেরকে খাছ করা হয়েছে। এখানে একটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। সেটি হ'ল আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রকৃত আলেম বা জ্ঞানী তারাই যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং আল্লাহ্‌র উলূহিয়াত ও একত্ববাদ সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়। অতঃপর তাঁর প্রেরিত অহি-র বিধানকে চূড়ান্ত সত্যের উৎস হিসাবে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে ও তা বাস্তবায়নে নিজের জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধিকে পুরোপুরি কাজে লাগায়।

৪. আয়াতের ব্যাখ্যাঃ

উপরোক্ত আয়াতে আসমান ও যমীন সৃষ্টি এবং মানুষের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য সৃষ্টিকে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের অন্যতম নিদর্শন হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। আসমান ও যমীন -এর কোন অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। পরে আল্লাহ্‌র হুকুমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। অনুরূপভাবে মানুষের ভাষা ও রং-বৈচিত্র্যের কোন অস্তিত্ব পূর্বে ছিল না। পরে আল্লাহ্‌র হুকুমে অস্তিত্ব লাভ করেছে। ভাষা তাই আল্লাহ্‌র এক অপূর্ব সৃষ্টি। মুখে বলার মাধ্যমে অথবা কলমে লেখার মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে। আব্বাসীয় যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আবুত ত্বাইয়িব আহমাদ বিন হুসায়েন আল-কিন্দী আল-কূফী ওরফে কবি আল-মুতানাব্বী (৩০৩-৩৫৪/৯১৫-৬৫ খৃঃ) বলেন,

إن الكلام لفى الفؤاد و إنما + جُعِلَ اللسانُ على الفؤاد دليلا

'কথা তো অন্তরেই জন্ম নেয়। ভাষা তো ভাবের প্রকাশকারী মাত্র'। যেমন তিনি দ্রুতগতি সম্পন্ন একদল ঘোড়ার উত্থিত ধূলি-ধূসরিত রাস্তার বর্ণনা দিয়ে বলছেন,

فى جحفل ستر العيون غبارهُ + فكأنما يُبْصِرْنَ بالأذان

'আমার প্রশংসিত ব্যক্তি (সায়ফুদ্দৌলা) এমন একটি দুর্ধর্ষ সেনাদলের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন, যাদের পদবিক্ষেপের উড়ন্ত ধূলি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় তারা চক্ষু নয় বরং কান দিয়ে পথ দেখে চলেছে'। ভাষার এই জাদুকরী শক্তিকে উৎসাহিত করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- إن من البيان لسحرا 'নিশ্চয়ই ভাষার মধ্যে জাদু রয়েছে'।[১] অন্যত্র তিনি কাব্যকে তীক্ষ্ণ তীরের সাথে তুলনা করেছেন এবং তাঁর সভাকবি হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর উদ্দেশ্যে বলেন, নিশ্চয়ই পবিত্র রূহ জিবরীল তোমাকে সর্বদা সাহায্য করবেন যতক্ষণ তুমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হ'তে কবিতা লিখবে'। তিনি দো'আ করেন এই বলে যে, اللهم أيِّده بروح القدس 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে পবিত্র রূহ (জিব্রীল) দ্বারা সাহায্য করুন'।[২] একবার কিছু মহিলাকে হাওদায় বসিয়ে উট চালক আনজেশাহ দ্রুত উট চালাচ্ছিল। এতে মহিলারা কষ্ট পাবেন মনে করে রাসূল (ছাঃ) উট চালক আনজেশাকে লক্ষ্য করে বলেন, رُوَيْدَكَ يا أنجشةُ لا تكسر القواريرَ 'ধীরে চালাও হে আনজেশাহ! কাঁচের পাত্র গুলো ভেঙ্গে ফেল না' = *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮০৬)*। কবিতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এর ভালগুলি ভাল ও মন্দগুলি মন্দ'।[৩] খন্দকের যুদ্ধে প্রচণ্ড দাবদাহে পাথর কেটে খন্দক খোঁড়ার ছাতিফাটা কষ্টের মধ্যেও তিনি কবিতার ছন্দে বলেন,

واللهِ لولا اللهُ ما اهتدينا + ولا تصدّقنا ولاصلينا

فأنزلنْ سكينةً علينا + و ثبت الاقدام إن لاقينا

إن الأولى قد بَغَوا علينا + اذا ارادوا فتنةً أبَيْنَا

(১) 'আল্লাহ্‌র কসম! যদি আল্লাহ আমাদের হেদায়াত না করতেন, তাহ'লে আমরা হেদায়াত পেতাম না। আমরা ছাদকাও করতাম না, ছালাতও আদায় করতাম না।

(২) অতএব (হে আল্লাহ) আপনি আমাদের উপরে বিশেষ শান্তি বর্ষণ করুন! এবং আমাদের পদ সমূহ দৃঢ় রাখুন, যদি তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে।

(৩) নিশ্চয়ই প্রথম পক্ষ আমাদের উপরে বিদ্রোহ করেছে। যখন তারা ফিৎনার ইচ্ছা করে আমরা তখন অস্বীকার করি'। শেষের 'আবায়না' অর্থাৎ 'অস্বীকার করি' কথাটি আল্লাহ্‌র রসূল (ছাঃ) দু'বার উচ্চ শব্দে বলেন'।[৪] ছাহাবী হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) বলেন, 'উক্ত কবিতা পড়তে পড়তে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খন্দক খুঁড়ছিলেন। এমতাবস্থায় তাঁর সমস্ত পেট ধূলি ধূসরিত হয়ে যাচ্ছিল' (ঐ)। ওদিকে মুহাজির ও আনছারগণও খন্দক খুঁড়ছিলেন ও কবিতা বলছিলেন-

---

১. বুখারী, মিশকাত 'ভাষা ও কাব্য' অধ্যায়, হা/৪৭৮৩।
২. বুখারী, মুসলিম হা/৪৭৮৯-৯১।
৩. দারাকুৎনী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৮০৭।
৪. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৯২।

http://islaminonesite.wordpress.com

نحن الذين بايعوا محمدا + على الجهاد ما بقينا ابدا

'আমরা তারাই যারা মুহাম্মাদের হাতে জিহাদের বায়'আত করেছি, যতদিন আমরা বেঁচে থাকব'। তাঁদের এই কবিতার জওয়াবে সেনাপতি নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবিতার ছন্দে জওয়াব দিয়ে বলেন,

اللهم لا عيش الا عيش الآخرة + فاغفر الانصار والمهاجرة

'হে আল্লাহ! কোন আরাম নেই, আখেরাতের আরাম ব্যতীত। অতএব তুমি ক্ষমা করো আনছার ও মুহাজিরদেরকে'।[৫] তিনি বলেন, إن المؤمن يجاهد بسيفه و لسانه 'নিশ্চয়ই একজন মুমিন জিহাদ করে তার তরবারি দিয়ে ও তার ভাষা দিয়ে'।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন, جاهدوا المشركين باموالكم و انفسكم و السنتكم 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের মাল দ্বারা, জান দ্বারা ও ভাষা দ্বারা'।[৭]

বস্তুতঃ ভাষা হ'ল আল্লাহ্র এক অপূর্ব সৃষ্টি। ভাষাহীন মানুষ বাকশক্তিহীন পশুর সমতুল্য। জানা যায় যে, 'পৃথিবীতে প্রায় ৫০০০ (পাঁচ হাযার) ভাষায় লোকে কথা বলে। তন্মধ্যে ভারতে ১৩০০টি ভাষা প্রচলিত।[৮] পৃথিবীর সর্বত্র মানুষের আকৃতি কমবেশী একই রূপ। হাত-পা, চোখ-কান, মুখ-নাক সকল দেশের সকল মানুষেরই রয়েছে। কিন্তু রং-রূপ, সৌন্দর্য ও ভাষার দিক দিয়ে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। ভাষা ও বর্ণের বৈষম্য ও বৈচিত্র্য শুধু পৃথিবীর এ প্রান্তে ও ওপ্রান্তের মধ্যে নয়। বরং নিজ বাড়ীতেই রয়েছে। একজন পিতার পাঁচটি সন্তান। কিন্তু কারু চেহারা ও বর্ণের সাথে কারু ষোলআনা মিল নেই। কারু কণ্ঠের সাথেও কারু কণ্ঠের মিল নেই। এমনকি একই ভাষা-ভাষী হয়েও কারু ভাষা জ্ঞান সমান নয়। একটি সন্তান সাহিত্যে ভাল তো অন্যটি বিজ্ঞানে ভাল। একটি সন্তান লেখায় ভাল তো অন্যটি বক্তৃতায়। এজন্যেই তো দেখি কবি নযরুলের ছেলেরা কেউ কবি হ'ল না। আব্বাস উদ্দীনের ছেলেরা কেউ গায়ক হ'ল না। সাহিত্যিক মাওলানা আকরম খাঁ-র ছেলেরা কেউ পিতার সমকক্ষ হ'ল না। পিতা-পুত্রে চেহারার মিল নেই, বর্ণে মিল নেই, কণ্ঠ স্বরে মিল নেই, মেযাজে মিল নেই, ভাষা জ্ঞানে মিল নেই। অথচ এই অজস্র বৈষম্যের মধ্যেও একটা সুন্দর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যাতে সহজে পিতা-পুত্র চেনা যায়। বৈষম্যের মাঝে এই সুন্দর মিল্, এই অটুট ঐক্য বন্ধন সৃষ্টি করা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যিনি সবকিছুর পরিকল্পক ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে প্রলয় ঊষার উদয়কাল পর্যন্ত এই সৃষ্টি বৈচিত্র্য চলতে থাকবে। কারু সাথে কারু মিল হবে না। অথচ সবার সাথে সবার মিল থাকবে- এ এক অপূর্ব সৃষ্টি, অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, অনির্বচনীয়- সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী সুবহা-নাল্লা-হিল আযীম। কত বড় তিনি, কত মহান তিনি!!

ভাষার ক্রমবিকাশঃ

(১) আরবী ভাষাঃ আরবী হ'ল সকল ভাষাগোষ্ঠীর মা। জান্নাতের ভাষা আরবী। সকল আসমানী কেতাব ও ছহীফা নাযিল হয়েছে আরবীতে। নবীগণ স্ব স্ব গোত্রের ভাষায় তা পৌঁছে দিয়েছেন (ইবরাহীম ৪)। কুরআনের বহু আয়াত ও নির্দেশ পূর্ববর্তী কিতাব ও ছহীফা সমূহে ছিল বলে খোদ কুরআনেই বলা হয়েছে। যেমন বর্ণিত হয়েছে, إن هذا لفى الصحف الأولى। 'নিশ্চয়ই এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে। ইবরাহীম ও মূসার কিতাব সমূহে' (আ'লা ১৮, ১৯)। তাওরাত, ইঞ্জীল বিলুপ্ত হওয়ার পিছনে এটাও একটি কারণ হ'তে পারে যে, এসব কিতাবের মূল ভাব আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আরবীতে নাযিল হ'লেও তার ভাষা ছিল নবীদের নিজস্ব। দ্বিতীয়তঃ এগুলি ছিল বিভিন্ন গোত্রের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত কিতাব। পক্ষান্তরে কুরআন একমাত্র গ্রন্থ, যা সকল মানুষের জন্য নাযিল হয়েছে এবং যার ভাব ও ভাষা সবই আল্লাহ্র। আর সে কারণেই এর একটি হরফও রদবদল হবার সম্ভাবনা নেই। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, কুরআনের তরজমাকে কখনোই কুরআন বলা হয় না। একারণে যে, কুরআনের সঠিক মর্ম অন্য ভাষায় যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেকারণে মুসলিম বিদ্বানগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, কুরআনের মূল আয়াত ব্যতীত শুধু তরজমা প্রকাশ করা যাবে না'।[৯]

আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সকল নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন (বাক্বারাহ ৩১)। নিঃসন্দেহে সকল ভাষাও তাঁকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। পরে তাঁর বংশধরগণ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে ও বিভিন্ন ভাষা বলতে থাকে। কখনো পারস্পরিক ভাষার মিশ্রণে আরেকটি নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। এই ভাবে ভাষার ক্রমবিকাশ ও বিস্তৃতি ঘটেছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশে প্রথম বিশুদ্ধ আরবীতে কথা বলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ)। যখন তাঁর বয়স মাত্র ১০ বছর।[১০] হযরত নূহ (আঃ)-এর

---

৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৯৩।
৬. শারহুস্ সুন্নাহ, আহমাদ, সনদ ছহীহ- আলবানী, মিশকাত হা/৪৭৯৫।
৭. আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত 'জিহাদ' অধ্যায় হা/৩৮২১।
৮. এম, আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ ও নতুন বিশ্ব (৩৮/১, বাংলাবাজার ঢাকা, ৩৫ তম প্রকাশ: মার্চ ১৯৯৮) ২য় অংশ পৃঃ৪২।
৯. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, আল-মুনজিদ-এর ভূমিকা।
১০. কুরতুবী ১/২৮৩-৮৪ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

দুই পুত্র হাম ও সাম -এর নামে হেমেটিক ও সেমেটিক দু'টি ভাষা গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। তবে সেমেটিক ভাষাই বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে আছে। সেমেটিক বা সামীয়দের আদি বাসস্থান সম্পর্কে আধুনিক পণ্ডিতগণ বিভিন্ন মত পোষণ করলেও আরব দেশই ছিল তাদের আদি বাসস্থান-এমতটিই অধিক প্রচলিত ও সর্ববাদী সম্মত। পবিত্র কুরআনেও মক্কা শহরকে 'উম্মুল ক্বোরা' অর্থাৎ পৃথিবীর 'সকল জনপদের মূল' বলা হয়েছে (আন'আম ৯২, শূরা ৭)। অতএব পৃথিবীর সকল মানবগোষ্ঠীর জন্য প্রেরিত প্রথম বিশ্বরসূল হিসাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর সন্তানেরাও যে মক্কা বা তার আশপাশে থাকবেন -এটা ধরে নেওয়া যায়। আফ্রিকার নিগ্রো, বার্বার ও মিসরীয়গণ হেমেটিক হিসাবে কথিত হ'লেও তাদের ভাষায় বিশেষ করে মিসরীয়দের ভাষায় সেমেটিক আরবী ভাষার প্রভাব সর্বাধিক।

পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় সামীয়রা ছড়িয়ে পড়ার ফলে তাদের ভাষায় তারতম্য দেখা দেয়। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান সেমেটিক ভাষাগুলি হ'লঃ আক্কাদীয়ান, ক্যানানাইট, উগারিটিক, এ্যামোরাইট, অ্যারামাইক, দক্ষিণ এরাবিক ও ইথিওপিক এবং এরাবিক। প্রথমোক্ত ভাষাটি পরবর্তীতে ব্যবিলনিয় এবং আসীরিয় নামে দু'টি স্বতন্ত্র ভাষায় বিভক্ত হয়। প্রাচীন মেসোপটেমিয় অঞ্চলে এমনকি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে আক্কাদীয় ভাষা কিছুকালের জন্য নিকট প্রাচ্যের আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবেও চালু ছিল।

(২) ফিলিস্তিনের প্রাচীন নাম কিন'আন-এর নামানুসারে ক্যানানীয় ভাষার উৎপত্তি। হিব্রু এই ভাষার সর্বাধিক প্রচলিত ধারা। হিব্রু ভাষাতেই সবচেয়ে বেশী সাহিত্য রচিত হয়েছে। তওরাত (Old Testament)-এর প্রায় সবটুকু এ ভাষাতেই লেখা হয়েছে। বর্তমান যুগেও ইহুদীরা এ ভাষা ব্যবহার করে থাকে। ক্যানানীয় ভাষার অপর ধারাটি হ'ল ফনিসিয়। টায়ার, সিডন, বাইব্লোস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচলিত এই ভাষা হিব্রুর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল।

(৩) মরু সাগরের তীরবর্তী 'মোয়াব' অঞ্চলে 'মোয়াবীয়' নামে ক্যানানীয় ভাষার আরেকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। এমনিভাবে সিরিয়া, জর্ডন, লেবানন, হাযারামাউত, ওমান, ইয়ামন তথা আরব উপদ্বীপে সেমেটিক ভাষা বিভিন্ন রূপে ও নামে বিস্তৃত ছিল। কিন্তু দক্ষিণ সেমেটিক ও উত্তর-পশ্চিম সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসাবে কেবলমাত্র আরবী ভাষার মধ্যেই আদি সেমেটিক ভাষার বৈশিষ্ট্য অধিক সংরক্ষিত রয়েছে। এভাষা তুলনামুলকভাবে এখনো অবিমিশ্র রয়েছে। প্রাক ইসলামী যুগেই এভাষার ক্লাসিক রূপ সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করে। অতঃপর এভাষায় কুরআন নাযিল হওয়ায় এবং এভাষার মাধ্যমে হাদীছ বর্ণিত ও সংকলিত হওয়ায় আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তের অধিবাসীদের আরবী ক্লাসিক বা লেখ্যরীতি মিশ্রনের দোষ থেকে প্রায় মুক্ত বলা চলে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের মিসর অভিযানের ফলে আরবী ভাষা ও সাহিত্যে রেনেসাঁর সূত্রপাত হ'লেও তার মূল ক্লাসিক রীতিকে ক্ষুন্ন করেনি। বরং বিভিন্ন অনারব শব্দ ও পদ্ধতিকে সাদরে বরণ করেও আরবী তার স্বকীয়তা অক্ষুন্ন রেখে সনৈঃ সনৈঃ এগিয়ে চলেছে। সেকারণে দেড় হাযার বছর পূর্বে রাসূল (ছাঃ) যে ভাষায় যা বলেছেন, আজকের আরবী ভাষীদের তা বুঝতে মোটেও কষ্ট হয় না। উক্ত সাহিত্যগত ঐক্যই আরবী ভাষাকে প্রাচীন ভাষা সমূহের ন্যায় অস্তিত্ব বিলুপ্তির আশংকা হ'তে রক্ষা করেছে। যেমনটি হয়েছে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা ল্যাটিনের ভাগ্যে। যা বিভক্ত হয়ে বর্তমানে ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি স্বতন্ত্র ভাষায় রূপলাভ করেছে। এমনিভাবে অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা 'সংস্কৃত' আজ ক্রমবিলুপ্তির পথে।

(২) **ইংরেজী ভাষাঃ** কথায় বলে 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না'। অর্থাৎ বিশ্বব্যাপি তাদের সাম্রাজ্য ছিল। কেননা ইংল্যাণ্ডে যখন রাত, ভারতবর্ষে তখন দিন। তাদের মুখের ভাষা ইংরেজী তখনকার ন্যায় আজও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে চালু রয়েছে। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের আদি পর্বে (৬৫০-১০৬৬ খৃঃ) কি বর্তমান যুগের ইংরেজীর অস্তিত্ব ছিল? বর্তমানে যে দ্বীপটিকে আমরা বৃটেন বলছি, তার নাম ছিল তখন 'এ্যালবিয়ন'। রোমকরা এ দ্বীপের শাসনভার ছেড়ে যাওয়ার পরে উত্তর জার্মানী, হল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক থেকে জলদস্যুরা এসে এ দ্বীপ দখল করল। তখনও তারা খৃষ্টান হয়নি। এর শতবর্ষ পরে তারা খৃষ্টান হয়। এদের সংশ্রবে যে ভাষার উৎপত্তি হয় তার নাম হয় Anglo-Saxon ভাষা। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের পরে ফ্রান্সের উত্তর উপকূল থেকে জলদস্যুরা এসে এ দ্বীপ দখল করে। দু'শো বছরের মধ্যে এরা মিশে গেল Anglo-Saxon -দের সাথে। ফরাসী ভাষা দ্বারা পুষ্ট সেই ইংরেজী ভাষাকে বলা হ'ত Anglo-Norman ভাষা। ইংরেজ জাতি তাদের আদি কাব্য 'বেওয়ূল্ফ' (Beowulf) নিয়ে গর্ব করে থাকেন। কিন্তু ৩২০০ চরণের এই মহাকাব্যে বর্ণিত কাহিনীর পটভূমি ইংল্যাণ্ড নয় বরং স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া বা দক্ষিণ সুইডেনে অবস্থিত। মূলতঃ বিষাদের সুরই হ'ল এ্যাংলো-স্যাক্সন সাহিত্যের প্রধান সুর। পরবর্তীতে ফরাসী প্রভাবিত এ্যাংলো-নরম্যান যুগ (১০৬৬-১৩৫০ খৃঃ) ছিল মূলতঃ রোমান্টিক কাব্যের যুগ। এরপরে ইংরেজী সাহিত্যের শুকতারা হিসাবে বরিত চসারের যুগ (১৩৪০-১৪০০ খৃঃ) পেরিয়ে ১৪৫৩ খৃঃ থেকে রেনেসাঁ যুগের সূত্রপাত হয়। এলিজাবেথীয় সাহিত্য হ'ল ইংল্যাণ্ডে রেনেসাঁর মহত্তম সৃষ্টি। ইতালী ও ফ্রান্সের কাছে এ সাহিত্য অনুজের মত ঋণী।

অতঃপর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে একে একে জন্ম নিলেন শেক্সপিয়ার (১৫৬৪-১৬১৬ খৃঃ), মিলটন (১৬০৮-৭৪), বায়রণ (১৭৮৮-১৮২৪), শেলী (১৭৯২-১৮২২), কীট্স (১৭৯৫-১৮২১) প্রমুখ দিকপাল গণ। কিন্তু বর্তমান যুগের ইংরেজী কি Anglo-Saxon বা

http://islaminonesite.wordpress.com

Anglo-Norman যুগের এমনকি শেক্সপিয়ার যুগের ইংরেজীর যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে? কখনই না। বরং আধুনিক যুগে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন- যা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র মাত্রই জানেন।

(৩) **উর্দূ ভাষাঃ** এটি অত্যন্ত কনিষ্ট ভাষা। যা হিন্দী ও ফারসীর সমন্বয়ে সিপাহীদের ভাষা হিসাবে ভারত বর্ষে জন্মলাভ করল। উর্দূ শব্দটি তুর্কী। যার অর্থ লশকর বা সেনাবাহিনী। দেশের বিভিন্ন এলাকার সৈন্যরা একটি ছাউনীতে দীর্ঘদিন অবস্থানের ফলে তাদের পারস্পরিক আঞ্চলিক ভাষার সংমিশ্রনে পৃথক একটি সৈনিক ভাষা সৃষ্টি হ'ল। বর্তমানে তা একটি ব্যাকরণের মাধ্যমে সুশৃংখল ভাষার মর্যাদা লাভ করেছে এবং এই ভাষায় মহাকবি ইকবাল, মির্যা গালিব, আলতাফ হোসায়েন হালী প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত কবির জন্ম হওয়ায় বর্তমানে উর্দূ বিশ্বমানের ভাষায় পরিণত হয়েছে। অন্ততঃ সার্ক দেশসমূহে উর্দূ সাধারণের বোধগম্য একটি জনপ্রিয় ভাষা।

(৪) **বাংলা ভাষাঃ** বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। অধিকাংশ বিদ্বানের মতে খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর দিকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়, যা 'পূর্ব প্রাচ্য প্রাকৃত ভাষা' হ'তে রূপান্তরিত। ভাষাতত্ত্ববিদ গণ মনে করেন যে, এই ভাষার মূল উৎস হ'ল বৈদিক সংস্কৃত। এটি প্রাচীন আর্য জাতির ভাষা। যারা খৃষ্টপূর্ব পনের শতকের পূর্বে ইরানের মধ্য দিয়ে এদেশে আগমন করে ও প্রধানতঃ উত্তর পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করে। ঋগ্বেদের সংহিতায় এ ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। অতঃপর এদেশের অনার্য ভাষাগুলোর সাথে মিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হয় 'প্রাকৃত' ভাষা। ক্রমে তারা পূর্বে বিস্তৃত হয় এবং খৃষ্টপূর্ব তৃতীয়-চতুর্থ শতকে মৌর্য সম্রাটদের আমলে এই 'প্রাকৃত ভাষা' বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রবেশ করে- যা 'পূর্ব প্রাচ্য প্রাকৃত ভাষা' নামে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। অতঃপর ছয়-সাত শো বছরের ক্রমবিবর্তনের ফলে এই ভাষা পরিবর্তিত হয়ে 'বাংলা ভাষায়' রূপ পরিগ্রহ করে। মগধ অঞ্চলে প্রচলিত 'মাগধী প্রাকৃত' হ'তে বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিধায় উড়িয়া ও অসমীয় ভাষা বাংলা ভাষার নিকটতম জ্ঞাতি।

খৃষ্টীয় সপ্তম বা দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা ভাষার প্রাচীন বা আদিযুগ বিস্তৃত। 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামক গ্রন্থের চর্যাপদগুলোতে এযুগের বাংলাভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়। অতঃপর খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ হ'তে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ ভাষার মধ্যযুগ বিস্তৃত। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কৃত্তি বাসের 'রামায়ণ' শাহ মুহাম্মাদ ছগীর-এর 'ইউসুফ জোলেখা' জৈনুদ্দীনের 'রসূল বিজয়' কাব্য এযুগের অন্যতম নিদর্শন। অতঃপর খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী হ'তে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা ভাষার আধুনিক যুগ। এযুগে শক্তিশালী গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় এবং ১২০০ হ'তে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই পদ্য ও গদ্য উভয় ক্ষেত্রে আধুনিক বাংলা ভাষার ভিত সুদৃঢ় হয়। বলা যায় যে, এযুগ হ'ল বাংলা ভাষার সামগ্রিক সমৃদ্ধির যুগ।

ভাষার পরিপুষ্টি সাধনঃ

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কালক্রমে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা ও ভাবের আদান-প্রদানের ফলে বিভিন্ন ভাষা পরিপুষ্ট হয়েছে। এমনকি সেখান থেকে নতুন ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সমৃদ্ধ ভাষা কালক্রমে হারিয়ে গেছে ও সে স্থানে নতুন ভাষার জন্ম হয়েছে। এক কালের সমৃদ্ধ ভাষা ল্যাটিন ও সংস্কৃত এখন এক প্রকার মৃত ভাষা। সংস্কৃত হ'তে প্রাকৃত অতঃপর প্রাকৃত হ'তে বাংলা ভাষায় উদ্ভব হ'লেও কালক্রমে বিভিন্ন ভাষার সংমিশ্রনে এভাষা যথেষ্ট রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে 'চর্যাপদের' বাংলা যেমন আমরা আধুনিক বাংলাভাষীরা বুঝতে পারিনা। Anglo-Saxon যুগের ভাষাও তেমনি আধুনিক ইংরেজদের নিকটে দুর্বোধ্য। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে ভাষার গতিও এগিয়ে চলেছে। যে ভাষা যত বেশী অন্য ভাষাকে হযম করতে পেরেছে, সে ভাষা ততবেশী গতিলাভ করেছে, ততবেশী পরিপুষ্ট ও বিস্তৃত হয়েছে। ঈরানী, আফগানী, মোগল, পাঠান, আরবী, উর্দূ, ফারসী ইত্যাদি ভাষার সংমিশ্রনে বাংলা ভাষাও তার অঙ্গ পুষ্ট করেছে এবং বিভিন্ন বাগবৈভব এ ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সাহিত্য হ'ল সমাজের আয়না সদৃশ। এর মধ্য দিয়েই একটি সমাজের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাঠকের সামনে ফুটে ওঠে। বাংলাদেশে প্রধানতঃ দু'টি ধর্মের মানুষ বসবাস করে। হিন্দু ও মুসলিম। তাদের রচিত সাহিত্যে উভয় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনা প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। কেননা হৃদয়ে উত্থিত ভাষার পরিশীলিত রূপই হ'ল সাহিত্য। তাই সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উভয়কে এক দেহে লীন করার চেষ্টা নিঃসন্দেহে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। 'কেননা সাহিত্যিক কোন্ ধর্মাবলম্বী সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেটা বড় কথা হ'লেও মূল কথা নয়। মূল কথা হচ্ছে, যে জীবন ও ভাবের পরিমণ্ডল রচিত হচ্ছে, সেটা কোন্ জীবন? কার জীবন?' রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরা সহিত্য কর্মে যেসব শব্দ সংযোজন করেছেন ও ভাষানুষঙ্গের সৃষ্টি করেছেন, তা মুসলমানের নয়। বরং বলা চলে 'যবন' 'ম্লেচ্ছ' ইত্যাদি বলে তিনি মুসলমানকে সরাসরি গালি দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম ভয়াবহ' এই পরম নীতি বাক্যের অনুসরণ করেছেন। একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু কবি হিসাবে তাঁর এই মনোভাবকে আমাদের অবশ্যই মেনে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের আরবী-ফারসী মিশ্রিত বাংলাকেও তাদের মেনে নিতে হবে। এখানে দেখার বিষয় হবে উভয়ের সাহিত্য নৈপুণ্য, ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতি নয়। রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের কবি না হ'লেও বাংলার অনন্য সাহিত্য প্রতিভা হিসাবে তাঁকে স্বীকৃতি দিতেই হবে। অনুরূপভাবে নযরুল-কায়কোবাদকেও সাদরে বরণ করার জন্য হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

মুসলিম কবির 'খুনের খুঁটি' দেখে যেন হিন্দু কবির 'রক্ত

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

উষ্ণ' না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। মোট কথা পারস্পরিক সহিষ্ণুতার মাধ্যমে উভয় সংস্কৃতির কবি-সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করবেন। বাংলা সাহিত্যের বাগিচাকে বিভিন্ন ফুলের সমারোহে সুশোভিত করবেন -এটাই আমাদের কামনা।

ভাষার সংঘাতঃ বৃটিশ আমলে ফারসীর বদলে ইংরেজী যখন বাংলাদেশে সরকারী ভাষা হ'ল এবং ইংরেজ কর্তৃক কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ খৃঃ) প্রতিষ্ঠিত হ'ল। অতঃপর উক্ত কলেজের পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার দেহ হ'তে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দাবলী ছাটাই করতে লাগলেন, তখন হিন্দু ও মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে শুরু হ'ল সাহিত্যিক সংঘাত। উক্ত ছাটাইয়ের প্রতিবাদে মুসলিম পুঁথিকারগণ অপ্রচলিত আরবী ফারসী শব্দ আমদানী করতে লাগলেন। ফলে হিন্দু বাংলা ও মুসলমানী বাংলা পৃথক হয়ে গেল। অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহে পুষ্ট হিন্দু কবি-সাহিত্যিকগণ শাসন শক্তি হারা মুসলমানদের নিতান্তই কৃপার চোখে দেখতে লাগলেন। এই সংঘাত-এর চূড়ান্ত রাজনৈতিক রূপ হ'ল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীন পাকিস্তানের সৃষ্টি। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকগণ কোলকাতার দাদাদের করুণা থেকে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু শুরু হ'ল আরেক সংঘাত। পূর্ব পাকিস্তানের একদল নামধারী মুসলিম সাহিত্যিক ভাবলেন দেশ বিভক্ত হ'লেও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভক্ত হয়নি। এঁদের পুরোভাগে রইলেন হুমায়ুন কবীর, কাযী আব্দুল ওয়াদূদ, এস, ওয়াজেদ আলী, রেযাউল করীম প্রমুখ। পরবর্তীকালে এঁদের অনুসরণ করলেন আবু সাঈদ আইয়ূব, গোলাম কুদ্দুস প্রমুখ। বর্তমান সময়ে এই দলের পুরোধা হ'লেন কবীর চৌধুরী, শামসুর রহমান ও সদ্য প্রয়াত আহমাদ শরীফ প্রমুখ। অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার করল আরেক মারাত্মক ভুল। পাকিস্তানের পাঁচটি প্রদেশের চারটিতে উর্দূ আছে, সেই অজুহাতে উর্দূকে তারা রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিল। এতে বাংলাভাষী এবং সংখ্যাগরিষ্ট লোকসংখ্যা অধ্যুষিত প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ফুঁসে উঠলো। কোলকাতার দাদাদের হাতে মার খাওয়া মুসলমানী বাংলার অনুসারীরা এবার পাকিস্তানী পাঠান-বেলুচের হাতে মার খাওয়ার ভয়ে আতংকিত হয়ে উঠলেন। এই সময়ে ঘোলা পানিতে মৎস্য শিকারের সুযোগ নিলেন ঐসব অখণ্ড বাংলাবাদী সাহিত্যিকগণ। ৮ই ফালগুন মোতাবেক ২১ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫২-তে ঢাকার রাজপথে পুলিশের গুলিতে লাশ পড়লো সালাম-বরকত-রফিক প্রমুখ তরুণের। বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেল। মুসলিম বাংলা প্রাণ পেল। সুযোগ-সন্ধানীরা পেচকের মত অন্ধকারে মুখ লুকালো। কিন্তু তারা বসে থাকেনি। বাংলা একাডেমী, মুক্তধারা প্রভৃতির আড়ালে তারা সক্রিয় রইল। তারা আজ আরও বেশী সক্রিয়। বিশেষ করে বর্তমান 'আওয়ামী' সরকারের আমলে তারা প্রকাশ্যে একটি গোষ্ঠীর রূপ ধারণ করে সকলের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। অতি বাংলাপ্রীতি দেখিয়ে তারা ২১শে ফেব্রুয়ারীকে পুজার দিবসে পরিণত করে ফেললো। মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গলঘট, প্রভাতফেরী, নগ্নপদ যাত্রা, বাসন্তী শাড়ী, শহীদ মিনারের নামে বেদীতে ফুল দিয়ে অর্ঘ নিবেদন- এসবই আজ ২১শে ফেব্রুয়ারীর অবিচ্ছেদ্য অনুষ্ঠান।

শেষ কথাঃ

বাংলা সাহিত্যে ঢাকা ও কোলকাতা কেন্দ্রীক দু'টি ধারা পূর্বেও ছিল, আজও আছে। ঢাকা কেন্দ্রীক সাহিত্য বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ট গণমানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। স্বভাবতঃই সেখানে ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের ছাপ থাকবেই। এছাড়াও তাদের সাহিত্যে এদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঋতু বৈচিত্র্য, গ্রামীণ জনগণের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা, অন্যান্য ধর্মের মানুষের দৈনন্দিন ক্রিয়া-কর্ম ও চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে থাকে। কিন্তু ঢাকায় বসে যারা কোলকাতা কেন্দ্রীক সাহিত্য রচনা করেন ও অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন দেখেন, তারা এদেশের সংখ্যাগরিষ্ট গণমানুষের চিন্তা-চেতনার সাথে গাদ্দারী করে থাকেন। ফোর্ট উইলিয়মী সাহিত্যিকেরা যেমন আরবী-ফারসী ছাটাই করে বাংলা ভাষায় শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছিল, এরাও তেমনি 'চর্যাপদকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন' (দৈনিক মুক্ত কণ্ঠ, ঢাকা ২১/০২/৯৯ইং) গণ্য করে আমাদেরকে হাযার বছর পিছনে নিয়ে যেতে চায়। তাদের এই তৎপরতা আত্মঘাতি পরিণাম ডেকে আনতে বাধ্য। কারণ সাহিত্য একটি দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। তাদের এই অপতৎপরতার ফলে বাংলাদেশ একদিন তার স্বাধীনতা হারিয়ে ভারতের পূর্ব বঙ্গ প্রদেশ হিসাবে পুণরায় এক দেহে লীন হয়ে যেতে পারে। সরকার যদি সত্যিকার অর্থে সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের প্রতিনিধি হয়ে থাকেন, তবে এই দেশদ্রোহী পেচকগুলোকে দমন করা সরকারের আশু কর্তব্য।

বাংলাভাষাকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করে তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা যেমন আমাদের জাতীয় কর্তব্য, তেমনি ইসলামের নামে শিরক ও বিদ'আত যুক্ত সাহিত্য সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থেকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সাহিত্য রচনা করাও আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব নির্ভর করছে এর আদর্শিক তথা ইসলামী স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুন্ন রাখার উপরে। সাহিত্যের মাধ্যমে জনগণের ইসলামী চেতনাকে শাণিত রাখার উপরে।

বাংলা কোন বিশেষ গোষ্ঠীর তৈরি ভাষা নয়। এ ভাষা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। এ ভাষাতেই আমাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে হবে। সেই ঐশী সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!!

http://islaminonesite.wordpress.com

আলেমদের অনুদারতাঃ

পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে হিন্দু-মুসলিম তিক্ত সম্পর্কের যুগে মুসলিম আলেমদের অধিকাংশ ইংরেজী বয়কট করার সাথে সাথে হিন্দু বাংলাও পরিত্যাগ কনের। তাঁরা বাংলার চাইতে উর্দূ-ফারসীর দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েন। মাওলানা আব্বাস আলী প্রথম 'মাসিক মোহাম্মাদী' বের করে বাংলায় সাংবাদিকতার পথে এগিয়ে আসেন। অতঃপর 'বাংলায় মুসলিম সাংবাদিকতার জনক' বলে পরিচিত মাওলানা আকরম খাঁ মোহাম্মাদী-র সম্পাদক হন এবং তাঁর ক্ষুরধার লেখনী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, তেমনি আলেম সমাজকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি উৎসাহী করে তোলে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, আলেম সমাজে ব্যাপক ভাবে বাংলার প্রতি অনীহা অব্যাহত থাকে। সম্ভবতঃ তারই ফলশ্রুতি হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ সাপ্তাহিক জুম'আর খুৎবা হ'তেও বাংলা বিদায় নেয় ও সেখানে লিখিত আরবী খুৎবা পাঠ করেই দায়িত্ব শেষ করা হয়। ফলে বাংলাভাষী মুছল্লীরা খুৎবার মাধ্যমে কুরআন-হাদীছের অমিয় বাণী হ'তে মাহরূম হয়। কমবেশী আজও সে নিয়ম জারি আছে।

সুখের বিষয় বাংলার 'আহলেহাদীছ' সমাজ সর্বদা জুম'আর খুৎবায় কুরআন-হাদীছকে মুছল্লীদের মাতৃভাষায় চিরকাল ব্যাখ্যা করে আসছে। বর্তমানে অনেক হানাফী মসজিদে শ্রোতাদের চাহিদা লক্ষ্য করে খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে আরেকটি বক্তৃতা অনুষ্ঠান বাংলাভাষায় চালু করা হয়েছে। যদিও এই তৃতীয় খুৎবা চালু করার কোন অনুমতি শরীয়তে নেই। এঁদের ধারণা খুৎবায় দাঁড়িয়ে আরবী ব্যতীত অন্য ভাষা বলা যায় না। অথচ খুৎবা কোন ক্বিরাআত নয়। এটি হ'ল ভাষণ- যা অবশ্যই শ্রোতাদের ভাষায় হওয়া স্বাভাবিক। অন্যদিকে ইসলাম বিশ্বধর্ম। ইসলামের নবী বিশ্বনবী। ইসলামকে বিশ্বব্যাপী সকল ভাষার সকল মানুষের নিকটে তাদের স্ব স্ব ভাষায় বুঝানো ও ব্যাখ্যা করার নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্র (নাহল ৪৪, ৬৪)। হানাফী মাযহাবের কোন বিশ্বস্ত ফিকহ গ্রন্থে আরবী ভাষায় খুৎবা দেওয়ার অপরিহার্যতা বিষয়ে কোন নির্দেশ পাওয়া যায় না। বরং আরবীর বদলে ফারসী ভাষায় খুৎবা দূরে থাক, বরং ছালাতে ক্বিরাআত পাঠের অনুমতি স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) দিয়েছেন বলে ফিকহ গ্রন্থ সমূহে বলা হয়েছে। অথচ তাদের মধ্যে এই ধরণের ফৎওয়া চালু হয়ে গেছে কিভাবে কার মাধ্যমে তার ইতিহাস আজও আমাদের গোচরে আসেনি।

দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের স্বার্থে আলেম সমাজকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় পারদর্শী হ'তে হবে। তবেই দ্বীন বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

দরসে হাদীছ

জুম'আর সুন্নাতী আযান

- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

[আত-তাহরীক অক্টোবর'৯৭ সংখ্যা ৭(১০) নং প্রশ্নোত্তরে দারুল ইফতা-র পক্ষ থেকে জুম'আর আযান একটি না দু'টি- এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত জওয়াব দেওয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বিষয়টি সম্পর্কে নিম্নের প্রশ্নের ন্যায় বারবার প্রশ্ন আসে। যেমন- 'জুম'আর এক আযান বা দুই আযানের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত কোন্‌টি? হযরত ওছমান (রাঃ) 'যাওরা' বাজারে যে আযান চালু করেছিলেন, তা কিভাবে ও কেন? আমাদের মসজিদে এটা নিয়ে সমস্যা হয়েছে। ছহীহ হাদীছ মোতাবেক সমাধান দানে বাধিত করবেন। আরেকটি বিষয় হ'ল হানাফী ভাইয়েরা ইমামের সম্মুখে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে জুম'আর ছানী আযান দেন, ছহীহ হাদীছ মোতাবেক এর সমাধান কি জানালে বাধিত হব।'

-মাহমূদুল হাসান
পিতাঃ আলহাজ্জ দেছারুদ্দীন আহমাদ
সাং- ইটাগাছা, পোঃ বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

সম্পাদকীয় বিভাগের পক্ষ হ'তে আমরা মাননীয় প্রধান সম্পাদক মহোদয়কে উক্ত বিষয়ে আলোচনা পেশ করার অনুরোধ করি। সে মোতাবেক দরসে হাদীছ-এর নিয়মিত কলামে তাঁর নিবন্ধটি পত্রস্থ করা হ'ল।- সম্পাদক]

عن السَّائب بن يزيدَ قال: كان النِّداءُ يومَ الجمعة أوَّله إذا جلسَ الإمامُ علَى المنبرِ على عهد رسولِ الله صَلى الله عليه و سلم و أبى بكرٍ و عمرَ فلمَّا كانَ عثمانُ و كثُرَ النَّاسُ زادَ النداءَ الثالثَ على الزَّوراءِ رواه البخارى

অনুবাদঃ 'হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে জুম'আর দিনের প্রথম আযান দেওয়া হ'ত যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন। অতঃপর যখন ওছমান (রাঃ) -এর যুগ এল এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরা' নামক স্থানে ৩য় একটি 'নিদা' বা আহবান ধ্বনি বৃদ্ধি করলেন'।[১]

হাদীছের ব্যাখ্যাঃ বর্তমান যুগে 'ছানী আযান' বলে পরিচিত খুৎবার আযানটিই জুম'আর দিনের একমাত্র সুন্নাতী আযান। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ), হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত ওছমান (রাঃ)-এর প্রথম যুগে চালু ছিল। তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রাঃ) এই নিদা বা আবহানকে 'আযান' বলতে অস্বীকার করেন। বরং তাঁর

১. বুখারী, মিশকাত 'জুম'আ' অধ্যায়, 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ পৃঃ ১২৩, হা/১৪০৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

ভাষায় এটি ছিল 'এ'লাম' (إعلام) বা 'হুঁশিয়ার ধ্বনি'। মিশকাতের ভাষ্যকার মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) বলেন, এই হুঁশিয়ার ধ্বনি সর্ব প্রথম হযরত ওমর (১৩-২৩ হিঃ) লোক সংখ্যা বৃদ্ধির বিবেচনায় বাজারে চালু করেন। সম্ভবতঃ সেটাই হযরত ওছমান (২৩-৩৫ হিঃ) বজায় রাখেন এবং তিনি এটাকে অন্যত্র একটি উঁচু স্থানে 'আযান' হিসাবে দেবার চিন্তা করেন। যা পরবর্তীতে লোকেরা গ্রহণ করে নেয়'।[২] ইমাম মাওয়ার্দী (৩৬৪-৪৫০ হিঃ) বলেন, ওছমানের চালু করা এই ডাক আযানটি ছিল 'মুহদাছ' (محدث) বা নব্য সৃষ্ট। তিনি এটা করেছিলেন মদীনার আয়তন বৃদ্ধি ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। ওমর (রাঃ) তাঁর যুগে প্রথম বাজারের লোকদের মসজিদে ডাকার জন্য এ ব্যবস্থা করেন। লোকজন জমা হ'লে তারপর (খুৎবার) আযান দেওয়া হ'ত'।[৩]

এক্ষণে যদি আমরা এটাকে 'আযান' ধরে নিই, তবে এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলের যামানায় জুম'আর আযান ছিল একটি যা খুৎবার প্রাক্কালে দেওয়া হ'ত। এক্বামতকে দ্বিতীয় আযান বলা হয়। সেকারণেই ওছমানের আযানকে উপরোক্ত হাদীছে তৃতীয় নিদা বা আযান বলা হয়েছে। (২) 'যাওরা' হ'ল মদীনার বাজারের একটি স্থানের নাম অথবা বাজারের সর্বাধিক উঁচু বাড়ীটির নাম, যার ছাদে দাঁড়িয়ে উক্ত আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। (মিরক্বাত)। (৩) খলীফা হিসাবে তাঁর এই আযান সর্বত্র চালু হবারই কথা। যেমন ইবনু হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২ হিঃ) বিভিন্ন হাদীছের আলোকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু আল্লামা ফাকেহানী বলেন যে, এই 'ডাক আযান' মক্কা শরীফে প্রথম চালু করেন (উমাইয়া গভর্ণর) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (৭৬-৯৬ হিঃ) এবং বছরাতে প্রথম চালু করেন হযরত মু'আবিয়া (৪২-৬০ হিঃ)-এর গভর্ণর যিয়াদ বিন আবু সুফিয়ান'।[৪] অপরদিকে চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (৩৫-৪০ হিঃ)-এর রাজধানী কূফাতে ওছমানী আযান চালু ছিল না।[৫] ইবনু হাজার বলেন, উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আবুদল মালেক (১০৫-১২৫ হিঃ) সর্ব প্রথম ওছমানী আযানকে বাহির থেকে মসজিদে নিয়ে আসেন,[৬] যা বর্তমানেও চালু আছে।

বুঝা গেল যে, **প্রথমতঃ** ওছমানী আযানকে আত্বা প্রমুখ বিদ্বান 'আযান' বলেই স্বীকার করেননি। **দ্বিতীয়তঃ** এই আযান মক্কা ও কূফাসহ ইসলামী খেলাফতের অনেক স্থানে চালু হয়নি। **তৃতীয়তঃ** হযরত ওছমান (রাঃ) এটাকে সর্বত্র চালু করার প্রয়োজন মনে করেননি বা উম্মতকে বাধ্য করেননি। **চতুর্থতঃ** বর্তমান যুগে একই মসজিদে মূল আযানের পূর্বে যে 'ডাক আযান' দেওয়া হচ্ছে এটি না রাসূলের সুন্নাত, না ওছমানের সুন্নাত। বরং এটি উমাইয়া খলীফা হেশামের সৃষ্ট নতুন প্রথা মাত্র। **পঞ্চমতঃ** যে পরিস্থিতিতে হযরত ওছমান (রাঃ) এই আযান মদীনায় চালু করেছিলেন, সেই পরিস্থিতি বর্তমানে নেই। এখন জামে মসজিদের সংখ্যা বেশী। সবার নিকটে ঘড়ি এবং প্রায় সকল মসজিদে মাইকে আযান হয়। জানা আবশ্যক যে, হযরত ওছমান (রাঃ)-এর সময়ে মদীনার অন্যান্য ওয়াক্তিয়া মসজিদের মুছল্লীগণ মসজিদে নববীতে এসে একত্রে জুম'আর ছালাত আদায় করতেন। এখন তা করেন না। **ষষ্ঠতঃ** আযান শোনার পরে মসজিদে রওয়ানা হ'তে হবে- জুম'আর ক্ষেত্রে এই ধারণা ভুল। সূরায়ে জুম'আর ৯ নং আয়াতে 'এযা নূদিয়া লিছ ছালা-তে' (اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة) বলে খুৎবার আযানের কথা বুঝানো হয়েছে, প্রচলিত 'ডাক আযানের' কথা নয়। সকল মুফাস্সির এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন এবং রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত দ্বারা সেটাই প্রমাণিত। যেমন সূরা মায়েদা ৬ আয়াতে বর্ণিত 'এযা কুনতুম এলাছ ছালা-তে ফাগসিলূ' (اذا كنتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم) -এর অর্থ 'যখন তোমরা ছালাতে দাঁড়াবে, তখন ওযূ করবে' -এটা নয়। বরং ছালাতে দাঁড়ানোর আগেই ওযূ করতে হবে। অনুরূপভাবে খুৎবার আযানের আগেই মসজিদে হাযির হ'তে হবে (কুরতুবী)। **সপ্তমতঃ** জুম'আর দিন হ'ল সর্বাধিক পবিত্র দিন ও মুমিনদের জন্য সাপ্তাহিক ঈদের দিন।[৭] এদিন আযানের পূর্বেই মসজিদে আসা সুন্নাত। ঐদিন খুৎবার আযানের পূর্বে যারা মসজিদে আসবেন তাঁরা ক্রমান্বয়ে উট, গরু, দুম্বা, মুরগী অতঃপর ডিম কুরবাণীর নেকী পাবেন। অতঃপর যখন খত্বীব মিম্বরে ওঠার জন্য বের হন, তখন দরজায় দাঁড়ানো ফেরেস্তাগণ আমলনামার খাতাপত্র গুটিয়ে নেন ও খুৎবা শুনতে থাকেন'।[৮]

বুঝা গেল যে, জুম'আর আযান মূলতঃ নিকটবর্তী লোকদের হুঁশিয়ার করার জন্য, যারা খুৎবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ব্যবসা বা অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকেন, দূরবর্তী লোকদের জন্য নয়'।[৯] একারণে তিরমিযী শরীফের খ্যাতনামা ভাষ্যকার

---

২. মিরক্বাত ৩/২৬৪ পৃঃ।
৩. তাফসীর মাওয়ার্দী ৪/২৩৭ পৃঃ।
৪. মির'আত ২/৩০৭।
৫. দ্রঃ তাফসীরে জালালায়েন পৃঃ ৪৬০, টীকা ১৯; তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১০০।
৬. মিরক্বাত ৩/২৬৩।
৭. মুসলিম, তিরমিযী, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩৫৬, ১৩৬৮ ও ১৩৯৮)।
৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৪।
৯. দ্রঃ তাফসীরে কুরতুবী ১৮/১০৪ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

فعل النبى صلى الله عليه و سلم و الائمة من بعده الى يومنا هذا অর্থাৎ এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছেন এবং তাঁর পরবর্তী নেতৃবৃন্দ আজ পর্যন্ত এটা করে আসছেন' (ঐ)।

আবুদাঊদের খ্যাতনামা ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন (১২৭৩-১৩২৯/১৮৫৭-১৯১১ খৃঃ) হেদায়া-তে দাবীকৃত উক্ত নিয়মটির পক্ষে স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ কোন দলীল আমার জানা মতে কখনোই প্রমাণ করা যাবে না (لم يثبت قط فيما اعلم)। বরং উক্ত দাবী বাতিল গণ্য হবে। যেমন ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হিঃ) থেকে ইবনু আবদিল বার্র বর্ণনা করেন যে, ان الاذان بين يدى الامام ليس من الامر القديم 'ইমামের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার প্রথাটি প্রাচীন যুগের নয়'।[১৫]

ইমাম ইবনুল হাজ্জ মুহাম্মাদ মালেকী 'মাদখাল' কিতাবে বলেন, জুম'আর সুন্নাতী আযান হ'ল যখন ইমাম মিম্বরে বসবেন, তখন মুওয়ায্যিন মিনারে উঠে আযান দিবে। এই নিয়ম বজায় ছিল রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে। অতঃপর যখন ওছমান (রাঃ) যাওরা-তে একটি আযান বৃদ্ধি করলেন, তখনও রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের ন্যায় খত্বীব মিম্বরে এবং মুওয়ায্যিন মিনারে এই নিয়মে আযান বজায় রাখলেন। অতঃপর যখন (উমাইয়া খলীফা) হেশাম বিন আব্দুল মালেক (১০৫-২৫ হিঃ) শাসন ক্ষমতায় এলেন, তখন তিনি ওছমানের (রাঃ) -এর 'যাওরা' বাজারের আযানকে মসজিদের মিনারে নিয়ে আসলেন এবং মিনারের আযান যেটা রাসূল (ছাঃ) আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর প্রথম যুগে ইমাম মিম্বরে বসার পরে দেওয়া হ'ত, ওটাকে ইমামের সম্মুখে নিয়ে আসলেন'।[১৬]

উপরের আলোচনায় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মসজিদের মিনারে 'ডাক আযান' দেওয়া এবং মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে 'ছানী আযান' দেওয়া সম্পূর্ণ রূপে বিদ'আতী প্রথা। এটা রাসূল (ছাঃ) বা খোলাফায়ে রাশেদীন কারু সুন্নাত নয়। বরং উমাইয়া খলীফা হেশাম কর্তৃক চালু কৃত বিদ'আত মাত্র।

পরিশেষে বলব, সূরায়ে নিসা-র ৫৯ নং আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী সবকিছু বাদ দিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর আযানের দিকে ফিরে যাওয়াই হবে সকল বিবাদের একমাত্র সমাধান ও নাজাতের একমাত্র নিরাপদ রাস্তা। যেখানে আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা কোন বিষয়ে ঝগড়া কর, তখন বিষয়টিকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও'। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!!

---

১৫. আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ, ৩/৪৩৩।

১৬. আওনুল মা'বূদ ৪/৪৩৩-৩৪।

আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেন, اتباع السنة ان يكون على المنارة او عند باب المسجد 'সুন্নাতের যথার্থ ইত্তেবা হ'ল মসজিদের মিনারে অথবা দরজায় আযান দেওয়া। যাতে অনুপস্থিতগণ শুনতে পান'।[১০] এক্ষণে খুৎবার আযানটি দরজা বরাবর বাইরে দাঁড়িয়ে মাইকে দিলেই উক্ত সুন্নাত আদায় হয়ে যায়।

(৪) ইমাম কুরতুবী (মৃঃ ৬৭১ হিঃ) বলেন, 'লোকেরা ওছমান (রাঃ)-এর সৃষ্ট ডাক আযানকেই 'মূল আযান' (اذان اصلىَ) ধারণা করেছে। অতঃপর তারা সেটাকে খুৎবার মূল আযানের সাথে একই সময়ে একত্রিত করেছে। যেটা একটি ধারণার উপরে আরেকটি ধারণা মাত্র (وهمًا على وهمٍ)। এখন আমি লোকদের দেখছি মদীনার মসজিদের মিনারে আযান দেওয়ার পরে পুনরায় ইমামের সম্মুখে মিম্বরের নীচে জামা'আতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আযান দিচ্ছে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন স্থানে লোকেরা যা দিত। অথচ এর সবগুলিই নব্য সৃষ্ট বা বিদ'আত (و كل ذلك مُحْدَثٌ)।[১১] একই ধরণের মন্তব্যে আহমাদ শাকির বলেন, আবুদাঊদে হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, كان يُؤَذَّنُ بين يدى رسول الله صلى الله عليه و سلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد 'যখন জুম'আর খুৎবার জন্য রাসূল (ছাঃ) মিম্বরে বসতেন, তখন মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হ'ত। এই অবস্থা আবুবকর ও ওমরের যুগে ছিল।[১২] কিন্তু সাধারণ লোকেরা এমনকি বহু বিদ্বান ব্যক্তি এই আযানটিকে ইমামের সম্মুখে মিম্বরের কাছে নিয়ে এসেছেন। এটা স্রেফ একটি তাক্বলীদী প্রথা মাত্র। এতে (অনুপস্থিত) লোকদের আহবানের ক্ষেত্রে কোন ফায়েদা নেই'।[১৩]

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মারগীনানী (৫১১-৯৩ হিঃ) স্বীয় 'হেদায়া' গ্রন্থে বলেন, ইমাম যখন মিম্বরে বসবেন ও মুওয়ায্যিন মিম্বরের সম্মুখে (بين يدى المنبر) দাঁড়িয়ে আযান দিবে - এই নিয়মটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে (بذلك جرى التوارث)। যদিও এই আযান ব্যতীত অন্য আযান রাসূলে (ছাঃ)-এর যামানায় ছিল না।[১৪] হেদায়া-র ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী স্বীয় 'বেনায়াহ' গ্রন্থে বলেন, يعنى هكذا

---

১০. তিরমিযী হা/৫১৬ টীকা, ২/৩৯৩ পৃঃ।

১১. ঐ তাফসীর ১৮/১০০।

১২. আবুদাঊদ আওন সহ 'জুম'আর দিবসে আহবান' অধ্যায়, হা/১০৭৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯৬৩।

১৩. ঐ, শরহ তিরমিযী ২/৩৯৩।

১৪. আওনুল মা'বূদ হা/১০৭৫-এর টীকা, ৩/৪৩৪-৩৫ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

প্রবন্ধ

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত অহি বিরোধী ফায়ছালা ও কুফরীর মূলনীতি

মূলঃ খালেদ বিন আলী আম্বারী

অনুবাদঃ আব্দুস সামাদ সালাফী*

(১০ম কিস্তি)

(৭) ঐ মুক্বাল্লেদ যে ইলম অর্জন করতে ও সত্যকে জানতে পারল অথচ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল বা তা প্রত্যাখ্যান করল এবং অপর মুক্বাল্লেদ যে ইলম অর্জন ও সত্যকে বুঝতে পারল না, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রকৃতপক্ষে এ দু'ধরনের লোকই আছে। প্রথমতঃ যে ইলম অর্জন করে এবং সত্যকে বুঝেও প্রত্যাখ্যান করল, সে বাড়াবাড়ি করল। তার জন্য যা ওয়াজিব ছিল তা সে বর্জন করল। কাজেই আল্লাহ্‌র নিকট তার কোন ওযরই গ্রহণযোগ্য হবে না। দ্বিতীয়তঃ যারা প্রশ্ন করা ও কোন ধরনের ইলম অর্জন করা হ'তে অপারগ, তারাও দু'ধরনের- (১) তারা হেদায়াত কামনা করে, এর প্রতিক্রিয়াও তার উপর হয় এবং তাকে (হেদায়াত) ভালও বাসে। কিন্তু সে তা পেতে সক্ষম নয় এবং কোন পথ প্রদর্শক না থাকায় তা অর্জনও করতে পারছে না। এর হুকুম ইলম ও আমলের অবগতির যুগের (হুকুমের মতই হবে) এবং যাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছায়নি তাদের মতই হবে। (২) যারা হক জেনেও প্রত্যাখ্যান করল, না সে হককে মানার ইচ্ছা পোষণ করল, না সে যে আক্বীদার উপর আছে তা ছেড়ে অন্য (যা সত্য) আক্বীদা গ্রহণ করার চিন্তা ভাবনা করল। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা বলে, হে আল্লাহ! আমি যে দ্বীনের উপর আছি এর চেয়েও যদি তোমার কোন ভাল দ্বীন আছে বলে জানতাম তাহ'লে আমি তাই গ্রহণ করতাম এবং আমি যে দ্বীনের উপর আছি তা ছেড়ে দিতাম। কিন্তু আমি যে আক্বীদার উপর আছি এর বাইরে কিছু আছে বলে আমি জানি না ও অন্য কিছু জানতে সক্ষমও নই। আর এটিই আমার শেষ প্রচেষ্টা ও শেষ জানা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যে আক্বীদার উপর আছে তাতেই তারা সন্তুষ্ট। অন্যকিছু তার উপর প্রভাব ফেলে না এবং সে অন্য কিছু অর্জন করতেও ইচ্ছা পোষণ করে না।

* অধ্যক্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

অপারগতা ও ক্ষমতা থাকার মধ্যে তার নিকট কোন পার্থক্য নেই। এরা দু'জনই অপারগ। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীকে প্রথম শ্রেণীর সাথে মিলানো যাবে না। কারণ এদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথম শ্রেণী যারা ইসলামের অবনতির সময় দ্বীনকে তলব করল কিন্তু তা পেতে সমর্থ হ'ল না। সে তা পেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে অপারগ ও অজ্ঞ থাকার কারণে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল বা ফিরে আসল। আর দ্বিতীয় শ্রেণী হক তলব করল না। বরং সে শিরকের উপরই মৃত্যুবরণ করল। যদি সে এটি তলব করত তাহ'লেও সে অপারগ হ'ত। কাজেই তলবকারীর অপারগতা ও প্রত্যাখ্যানকারীর অপারগতার মধ্যে পার্থক্য আছে। অতএব এখানে চিন্তার বিষয় রয়েছে। আল্লাহ্ ক্বিয়ামতের দিন তার বান্দাদের মধ্যে নিজ নির্দেশ ও ইনসাফ দ্বারা ফায়সালা করবেন। আর রাসূল দ্বারা 'হুজ্জত' (দলীল) কায়েম করা ছাড়া (কাউকে) আযাব প্রদান করবেন না। এটি সমস্ত মাখলূকের ব্যাপারে অপরিহার্য। কিন্তু ব্যাক্তিগত ভাবে যায়েদ ও আমরের উপর হুজ্জত বা দলীল কায়েম হয়েছে কি-না এ ব্যাপারে আমাদের অনধিকার চর্চা করা ঠিক হবে না। বরং এটি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিতে হবে। বরং বান্দাদের জন্য এ আক্বীদা পোষণ করা ওয়াজিব হবে যে, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করবে, সে কাফের এবং (এ আক্বীদাও পোষণ করতে হবে যে,) মহা পবিত্র আল্লাহ তা'আলা রাসূল দ্বারা 'হুজ্জত' কায়েম না করে কাউকেও আযাব দিবেন না। এটি সার সংক্ষেপ। আর ব্যাক্তি বিশেষের কাফের হওয়া না হওয়ার হুকুমটি আল্লাহ্‌র উপর ন্যাস্ত করতে হবে। এটি নেকী ও শাস্তির ব্যাপারে। কিন্তু দুনিয়ার হুকুম বাইরে যা দেখা যাবে সে হিসাবেই তার উপর জারি হবে।

(৮) যাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাত্বেনী (গোপনীয়) ভাবে যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এর প্রতি ঈমান রাখে এবং হক বা রাসূল যা এনেছেন তার অনুসরণের ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু সে ভুল করে বসে ও হক বুঝতে না পারে, এমন ব্যক্তিকে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। আর যে সত্য-মিথ্যা বুঝে এবং পাপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্তেও বিরোধিতা করে, সে পাপী। নিঃসন্দেহে সে আযাবের যোগ্য। প্রথমোক্ত ব্যাক্তি ইচ্ছা করে পাপ করেনি বরং সে ভুল করেছে। আর আল্লাহপাক এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মাদির) ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(৯) ব্যাক্তিবর্গের অবস্থা ভিন্নতর হওয়ার কারণে কুফুরীর হুকুমটিও ভিন্নতর হবে। কাজেই প্রত্যেক ভুলকারী বিদ'আতী, মূর্খ, পথভ্রষ্ট, কাফের, এ কথা বলা যাবে না। এমনকি তাকে ফাসেক বা অবাধ্যও বলা যাবে না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ এভাবেই বলেছেন।

http://islamionesite.wordpress.com

কোন কোন সময় নির্ভেজাল শরীয়ত মেনে চলতে ইচ্ছুক ব্যাক্তিদের পথ চলা অত্যন্ত কষ্টকর হয় অথবা তাঁরা অপারগ হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, নতুন কিছু সংযোগ করে চললে অসুবিধা হয় না। কারণ তখন নির্ভেজাল পথে চলার কোন পথিক থাকে না। যখন পরিষ্কার আলো পাওয়া যায় না, তখন তো মানুষের সামনে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই থাকে না। কাজেই আধারযুক্ত আলোর অনুসরণ করলে কোন লোককে দোষারোপ করা যাবে না এবং তাঁকে নিষেধও করা যাবে না। হ্যাঁ যখন পরিষ্কার আলো পাওয়া যাবে (তখন যদি কেউ তা অনুসরণ না করে) তখন তাকে দোষারোপ করা যাবে। অন্যথা যারা অন্ধকারযুক্ত আলো থেকেও বিরত থাকে তারা তো আলো থেকে একেবারেই বেরিয়ে যাবে।

ঐ সমস্ত লোক যারা হাসানাতের বা ভাল-র কামালিয়াতে পৌঁছতে অক্ষম এবং পাপ করতে বাধ্য, তাদেরকে অপারগ মনে করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فاتقوا الله ما استطعتم 'সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর'। তিনি আরো বলেন, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 'আল্লাহ সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ করতে বাধ্য করেন না' (বাক্বারাহ ২৮৬)। তিনি আরো বলেন, والذين آمنوا و عملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 'যারা ঈমান আনল ও সৎ কাজ করল, (তাদের কাউকে) সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজ করতে বাধ্য করি না, তাঁরা জান্নাতী এবং সেখানে তাঁরা সর্বদা থাকবে'। এটাই ওযন ও আদলের পথ। যারা এপথে চলবে তারা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, যার জন্য আল্লাহ কিতাব ও মীযান অবতীর্ণ করেছেন।

(১০) "إطلاق" ও "تعيين" অর্থাৎ নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের মধ্যে পার্থক্য করা ওয়াজিব। কিতাব ও সুন্নাতে শাস্তির যে প্রমাণাদি আছে ও ঈমামগণের নিকট কুফরী ও ফাসেকীর যে দলীল সমূহ আছে তাতে এটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। হ্যাঁ যদি শর্ত সমূহ পাওয়া যায় এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি দূরীভূত হয় তাহ'লে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কাফের বা ফাসেক বলা যেতে পারে। এতে মূল ও শাখার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা কিছু এনেছেন তা জানা, তার প্রতি ঈমান আনা ও সে হেদায়াতকে গ্রহণ করা ওয়াজিব এবং এর বিপরীত করা সরাসরি কুফরী। আল্লাহ্র গুণাবলীকে অস্বীকার করা কুফরী। আল্লাহ তা'আলাকে আখেরাতে দেখা যাবে না বলা অথবা তিনি আরশের উপর সমাসীন, কুরআনুল কারীম আল্লাহ্র কালাম, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্র সাথে কথা বলেছেন, তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে খলীল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, এগুলোকে মিথ্যা ভাবা কুফরী। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন লোককে বলা যে, 'তুমি কাফের' অথবা 'সে কাফের' অথবা একথা বলা যে, 'সে জাহান্নামী', এটি নির্দিষ্ট দলীলের উপর নির্ভর করছে। কারণ হুকুম বা ফায়সালা শর্ত সাপেক্ষে হয়ে থাকে এবং এর নিষেধাজ্ঞাগুলি দূরীভূত হওয়ার পর হয়ে থাকে।

যখন উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে এটি জানা গেল, তখন ঐ ধরনের মূর্খ এবং তাদের মত লোকদের ফৎওয়া জারী করা যে, 'ওমুক কাফের' 'ওমুক কাফের' জায়েয হবে না। কথাটি বা কাজটি কুফরীর হ'লেও যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে যে, সে (নির্দিষ্ট লোকটি) জেনে-বুঝে নবীগণের বিরোধিতা করছে ততক্ষণ তাকে কাফের বলা যাবে না। সমস্ত নির্দিষ্ট ব্যক্তির কুফরীর ফৎওয়া দেওয়ার ক্ষেত্রে এ নিয়মই অনুসরণ করতে হবে। *-ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ১০/৩৭২।*

(ইবনে তায়মিয়া বলেন) যারা আমার সাথে উঠাবসা করেন তাঁরা জানেন যে, আমি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে অন্যতম যারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে কাফের, ফাসেক বা পাপী বলা থেকে নিষেধ করে থাকে। কিন্তু যে লোকের নিকট রেসালাতের প্রমাণাদি কায়েম হয়ে থাকে, অতঃপর এর বিরোধিতা করার কারণে তাকে কখনো কাফের, কখনো ফাসেক এবং কখনো গোনাহগার বলা যায় (এ ক্ষেত্রে আমিও বলে থাকি)। আমি পুনরায় বলছি যে, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের ভুলগুলিকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, সেগুলি কাওলী মাসআলা গুলিতে হউক বা ফে'লীতে হউক। প্রথম যুগের আলেমগণ অনেক বিষয়ে দ্বি-মত পোষণ করেছেন। এমনকি ঝগড়া-বিবাদও করেছেন। কিন্তু কেউ কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কাফের, ফাসেক বা পাপী বলে ফৎওয়া দেননি।

আমি মানুষের সামনে এ কথা বলে থাকি যে, সালাফে ছালেহীন ও ইমামগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, কেউ যদি এ ধরনের কথা (কোন কুফুরী কালাম) বলে, তাহ'লে সে কাফের, একথাটি ঠিক। কিন্তু আম ভাবে বলা ও নির্দিষ্ট ভাবে বলার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে। আর মৌলিক বড় বড় মাসআলা গুলোর মধ্যে প্রথম মাসআলা যা নিয়ে উম্মতের লোকজন মতবিরোধ বা ঝগড়া করেছেন তাহ'ল وعيد বা শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা। কারণ কুরআনে করীমে ভয় প্রদর্শনের আয়াতগুলি আম ভাবেই এসেছে। যেমন- আল্লাহপাক বলেন, إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا..... 'যারা এতিমদের মাল

http://islaminonesite.wordpress.com

অন্যায়ভাবে ভক্ষন করে তারা নিজেদের পেটে অগ্নিই ভর্তি করেছে এবং তারা সত্তরই জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (নেসা ১০)। এভাবে যতগুলো আয়াত এসেছে যেমন- যে এই কাজ করবে তার এই শাস্তি, যে এই কাজ করবে তার এই শাস্তি। এগুলো আম কথা। এধরনের কথা যা প্রথম যুগের লোকেরা বলত যে, কেউ যদি এধরনের কথা বলে তাহ'লে সে এরকম (কাফের বা ফাসেক) ইত্যাদি। এর পরেও নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রকার কুফরী বা ফাসেকী অথবা পাপ কাজ করে থাকে, তাহ'লে তার তওবার কারণে অথবা সে এমন নেকীর কাজ করল যার কারণে তার এ পাপগুলি মাফ হয়ে যেতে পারে বা এমন ধরনের বালা-মুছীবত এসে তাকে ঘিরে ধরল, যাতে তার পাপগুলি ধোয়ে পরিষ্কার হ'য়ে গেল অথবা এমন সুপারিশকারী তার জন্য সুপারিশ করলেন, যার সুপারিশ আল্লাহ কবুল করেন, তাহ'লে তার শাস্তি রহিত হয়ে যেতে পারে।

কুফরী বলাও এক ধরনের আযাব বা শাস্তি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথাকে যদি কেউ মিথ্যা বলে, সেটি কখনো নতুন মুসলমান হওয়ার কারণে অথবা দূর পল্লীতে বসবাস করার কারণে (তার এ কথা বা হাদীছগুলো অজানা ছিল) হয়ে থাকে। কাজেই এ ধরনের কোন আয়াত বা হাদীছকে অস্বীকার করলে তাকে কাফের বলা যাবে না। যতক্ষণ না তার উপর দলীল কায়েম হয়। আবার কখনো এরকমও হয় যে, সে আয়াতটি শুনেনি। অথবা শুনেছে কিন্তু সেটি যে ঠিক এটিই তা তার নিকট প্রমাণিত হয়নি। অথবা অপর একটি আয়াত এর বিরোধী বলে মনে হয়েছে, যার কারণে এর তা'বিল করা ওয়াজিব মনে করেছে, যদিও এ ব্যাপারে সে ভুলের মধ্যে পতিত হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও তদানিন্তন বাদশাহগণ জাহ্মিয়াদের মত "إن القران مخلوق" 'কুরআন মাখলূক বা সৃষ্টি বস্তু' এবং 'আল্লাহ্কে আখেরাতে দেখা যাবে না' ইত্যাদি বলত। তারা মানুষকে এদিকে ডাকত। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিতনা তাদেরকে কাফের বলত ও বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দিত। এমনকি কোন লোককে বন্দী করলে জাহ্মিয়াদের মত কুরআনকে সৃষ্টি বস্তু না বললে ছাড়ত না। কোন লোককে গভর্ণর বানাত না ও বায়তুল মাল থেকে কাউকে ভাতা প্রদান করত না যতক্ষণ না তারা কুরআনকে মাখলূক বলে মানত। তা সত্ত্বেও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাদের জন্য রহমত কামনা করেছেন ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। কারণ তিনি জানতেন যে, এদের নিকট এটি এখনও পরিষ্কার নয় যে, তারা রাসূলের (ছাঃ) প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে এবং তিনি যা এনেছেন তা তারা অস্বীকার করছে। তারা তা'বিল করেছে কিন্তু তাতে তারা ভুল করেছে এবং তারা উক্ত (ভ্রান্ত) মতের তাক্বলীদ করেছে।

ইবনে ওবাই আল-ইয্য বলেন, হারাম বিদ'আতী কথা ঐগুলো, যাতে রাসূল (ছাঃ)-এর বর্ণিত কথাগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং তাঁর নিষেধগুলিকে চালু করা হয়েছে অর্থাৎ তিনি যা নির্দেশ করেছেন তা নিষেধ করা ও তাঁর নিষেধগুলিকে নির্দেশ করা। এ ব্যাপারে সত্য কথাই বলতে হবে এবং তার জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে প্রমাণিত আযাব সাব্যস্ত করতে হবে এবং এটি যে কুফরী তা তাকে জানিয়ে দিতে হবে। আর বলতে হবে যে, যে এ ধরনের কথা বলবে সে কাফের। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বহু মশহূর আলেম বলেছেন যে, কুরআন মজীদ আল্লাহ্র মখলূক, আখেরাতে আল্লাহ্কে দেখা যাবে না ও কোন ঘটনা ঘটার পূর্বে আল্লাহ জানেন না ইত্যাদি বলা কুফরী।

তবে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, সে কি জাহান্নামী অথবা সে কি কাফের? এর উত্তরে বলব, 'না'। বরং তার ব্যাপারে বৈধ সাক্ষী ছাড়া অন্য কোন সাক্ষী দিব না। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন না, তার উপর রহম করবেন না বরং সে সর্বদা জাহান্নামে থাকবে। এরূপ কথা বলা যাবে না। কারণ এই হুকুমটি (শুধু) কাফেরের মৃত্যুর পরেই দেওয়া যায়।

এ জন্যই আবুদাঊদ শরীফে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে শুনেছি, তিনি বলেন, 'বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু'জন লোক ছিল, একজন পাপ কাজে লিপ্ত ছিল এবং অন্য জন ভাল ইবাদত গুজার ছিল। ইবাদতকারী লোকটি সব সময় অন্যজনকে শুধু পাপ কাজে লিপ্ত থাকতে দেখে বলত, ভাই পাপ কাজ কম কর। অন্য একদিন তাকে পাপ কাজ করতে দেখে ভাল লোকটি পুনরায় বলল, ভাই পাপ কম কর। এতে পাপী লোকটি বিরক্ত হয়ে বলল, আমাকে আমার প্রভুর সাথে ছেড়ে দাও। তুমি কি আমার উপর দারোগা হয়ে প্রেরিত হয়েছ? আবেদ লোকটি তখন বলল, আল্লাহ্র কসম তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, অথবা তোমাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। অতঃপর তাদের জীবনাবসান ঘটলে আল্লাহপাক তাদেরকে একত্রিত করে আবেদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে জানতে? আমার নিকটে যা আছে তার উপর তোমার কি কোন ক্ষমতা বা অধিকার ছিল? এবং পাপীকে বললেন,

http://islaminonesite.wordpress.com

যাও আমার রহমত দ্বারা জান্নাতে প্রবেশ কর। অন্যজনের জন্য (আবেদ) বলা হ'ল- একে জাহান্নামে নিয়ে যাও। আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন! সে (আবেদ) এমন একটি কথা বলেছিল যাতে তার দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই নষ্ট হয়ে গেল'। -হাদীছটি হাসান।

নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা মুজতাহেদ ক্ষমার যোগ্য হ'তে পারে। কারণ হয়ত তার নিকট শরঈ কোন দলীল পৌঁছেনি। অথবা তার বড় ঈমান ও নেকী আছে যাতে করে আল্লাহ্র রহমত ওয়াজেব হয়ে গেছে। যেমন- ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে বলেছিল, আমি মরে গেলে আমার শরীর পুড়িয়ে ভষ্ম করে পানিতে ও বাতাসে উড়িয়ে দিও। পরে আল্লাহ্র ভয় তার অন্তরে আসার কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। তার ধারণা ছিল ঐ ছাইগুলি হ'তে তাকে একত্রিত করে পুনরায় জীবিত করতে পারবেন না। অথবা সে এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিল। এটা আখেরাতের ব্যাপার, এতে করে তাকে বিদ'আত হ'তে বাচাবার জন্য ও তওবা করবার জন্য কোন শাস্তি দেয়া যাবেনা এমন কথা নয়। সে যদি তওবা করে ভাল, নচেৎ আমরা তাকে কতল করব।

এরপরও যদি কথাটি কুফরী কথা হয় তাহ'লে বলতে হবে এটি কুফরী কথা। আর যে কথাটি সে বলেছে, শর্ত সাপেক্ষে তাকে বলা হবে যে, কুফরী করেছে। আর এটা শুধু তখনই হবে যখন সে শয়তান, মুনাফেক হবে। আর যিন্দীক (কপট) মুনাফেক ছাড়া ইসলাম প্রকাশকারী কোন আহলে কেবলা এধরনের কুফরী কথাবার্তা বলবে এটা ধারণা করা যায় না। আর কথাটি কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। (ক) প্রথম ভাগ মুশরিক ও আহলে কেতাবদের কাফের, যারা কালেমায়ে শাহাদত পড়ে না। (খ) দ্বিতীয় ভাগ হচ্ছে ভিতরে ও বাইরে মোমেন। (গ) তৃতীয় ভাগ যারা প্রকাশ্যে কালেমা পড়েছে কিন্তু অন্তর দিয়ে নয়। এই তিন প্রকারের কথা সূরা বাক্বারাহ্র প্রথমেই বলা হয়েছে। ঐ সমস্ত লোক যারা আসলে কাফের কিন্তু বাইরে কালেমা পড়েছে, সে যিন্দীক বা কপট ছাড়া আর কিছু নয়, আর তাকেই মুনাফেক বলা হয়।

[চলবে]

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত

*-অধ্যক্ষ আব্দুছ ছামাদ**

اُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

'আপনি জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে লোকদেরকে আপনার পালনকর্তার পথে আহ্বান করুন! আর উত্তম পন্থায় আপনি তাদের সাথে বিতর্ক করুন! নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক সে ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে ব্যক্তি তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনি সেই লোকদেরকেও ভাল করে জানেন যারা সঠিক পথে রয়েছে' (নাহাল ১২৫)।

এ আয়াতে দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমের পথ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত ও প্রচারের ক্ষেত্রে বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্য এবং উপদেশ মূলক কথাবার্তা বলতে গিয়ে বিনয়-নম্রতা ও শিষ্টাচারের নীতি অবলম্বন একান্ত বাঞ্ছনীয়। হেকমত ও সদুপদেশের ভিত্তিতেই তাবলীগ ও প্রচারের কাজ চালাতে হবে। হেকমত ও সদুপদেশ বিহীন দাওয়াতে ব্যর্থতা অনিবার্য হয়ে দেখা দিতে পারে।

উল্লেখিত আয়াতে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। হেকমত, সদুপদেশ এবং উত্তম পন্থায় বিতর্ক। জ্ঞানী ও সুধী জনমণ্ডলীর মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গেলে হেকমতের মাধ্যমে তাদেরকে আহবান জানাতে হবে। হেকমত ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা তাদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করা সম্ভব। সাধারণ জনতার মাঝে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে গেলে সদুপদেশের আশ্রয় গ্রহণ একান্তভাবে কাম্য। সদুপদেশের মাধ্যমে সাধারণ শ্রোতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ সহজসাধ্য। সদুপদেশ মূলক উত্তম কথা সাধারণ দাওয়াতের জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি। আর যাদের অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ বিদ্যমান, যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমী মনোভাবের দরুন হক কথা মেনে নিতে নারায, তাদেরকে উত্তম পন্থায় বিতর্কের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে আহবান জানাতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে আসলে তর্ক-বিতর্ক তাবলীগ ও দাওয়াতের মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু দাওয়াতের পথে কোন কোন সময় তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজনও দেখা দিতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, দাওয়াত কারো কোন চিন্তাধারার

---

* *নায়েবে আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও অধ্যক্ষ, মাদরাসাতুল হাদীছ, নাযিরা বাজার, ঢাকা।*

http://islaminonesite.wordpress.com

উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং দাওয়াত হচ্ছে পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি।*

এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর অনুসারীদেরকেও শরীক করেছেন। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

قُلْ هٰذِهِ سَبِيْلِى أَدْعُوْا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِى وَ سُبْحَانَ اللهِ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ

'আপনি বলুন! এ আমার পথ। আমি বুঝে সুঝেই আল্লাহ্র দিকে আহবান জানিয়ে থাকি স্বয়ং আমি এবং আমার অনুসারীগণ। আল্লাহ পবিত্র। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' (ইউসুফ ১০৮)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অনুসারী বলতে অনেকের মতে ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর সরল সহজ পূত-পবিত্র। তাঁদের বিবেক-বুদ্ধি ব্যাপক ও সুগভীর। তাঁদের কর্মবহুল পবিত্র জীবনে লৌকিকতার নামগন্ধও ছিল না। মহান আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর রাসূলের (ছাঃ) সাহচর্য ও সেবা-যত্নের জন্য মনোনীত করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন সৎ পথের পথিক। ব্যাপক অর্থে যাঁরা কিয়ামত কাল পর্যন্ত আল্লাহ্র রাসূলের (ছাঃ) দাওয়াতকে উম্মতের সর্বস্তরের লোকদের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত, তাঁদেরকেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর অনুসারী হিসাবে ধরে নিতে হবে। আসলে তাঁরাও ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর পথের সহযাত্রী। এতদ্বারা আরও জানা যাচ্ছে যে, যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণের দাবী করে থাকে তাদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দিয়ে কুরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা।

আয়াতের শেষাংশে যা বলা হয়েছে তার সারৎসার হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং তিনি নিজেও আল্লাহ্র দাস এবং মানুষকেও তিনি আল্লাহ্র দাসত্ব স্বীকার করার দা'ওয়াত প্রদান করতেন। তবে দা'ওয়াত প্রদানকারী আল্লাহ্র পথে আহবানকারী হিসাবে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কর্তব্য। যেমন- আল্লাহ বলেছেন-

يَاأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا. وَ دَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا

'হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে এবং আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর পথে আহবানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে প্রেরণ করেছি' (আহযাব ৪৫-৪৬)।

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে তিনি যে আল্লাহ্র অনুমতিক্রমে তাঁর পথে আহবানকারী ছিলেন এ কথারও উল্লেখ রয়েছে। তিনি মানব মণ্ডলীকে মহান আল্লাহ্র অনুমতি সাপেক্ষেই তাঁর পথে আহ্বান জানাতেন। তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজ বাস্তবিকই সুকঠিন, যা আল্লাহ্র অনুমতি ও সাহায্য ব্যতিরেকে মানুষের সাধ্যাতীত। মানব সম্প্রদায়কে আল্লাহ্র পথে আহবান করাই ছিল নবী-রাসূলদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। তাঁদের সর্বপ্রকার শিক্ষাই হচ্ছে এ দাওয়াতের ব্যাখ্যা। এ তাবলীগ ও দাওয়াতের সুকঠিন কাজটি আল্লাহ ও রাসূলের (ছাঃ) মনোনীত পন্থায়ই চালিয়ে যেতে হবে। ইসলামের দাওয়াত পরিবেশনের ক্রমিক ধারা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় উপদেশ সম্বলিত একটি হাদীছ প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করছি-

عن عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن انك ستأتى قوما من أهل الكتاب فإذا جئتَهم فادعوهم إلى ان يشهدوا ان لا اله إلا الله و أن محمدا رسول الله فان هم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليكم خمس صلوات فى كل يوم و ليلة فان هم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم فان هم أطاعوا لك بذلك فاياك و كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينه و بين الله حجاب-

'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামেনে প্রেরণ করেছিলেন তখন তিনি তাঁকে নির্দেশ প্রদান করেছিলেন যে, তুমি এক আহলে কিতাব কওমের কাছে যাচ্ছ, যখনই তুমি তাদের কাছে যাবে তখন তাদেরকে প্রথমেই এই আহ্বান জানাবে- তোমরা এই সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। তারা তোমার এই কথা মেনে নিলে তাদেরকে এই সংবাদ দিবে যে, আল্লাহ তোমাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের কাছ থেকে তা আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করবে। তারা এই কথাও মেনে নিলে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে যেন যাকাত আদায় কালে বেছে বেছে

---

* হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) على بصيرة -এর ব্যাখ্যায় বলেন, برهان عقلى وشرعى 'আমার জ্ঞান ও শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে'। কুরতুবী বলেন, على يقين وحق 'একীন ও হক -এর ভিত্তিতে। চিন্তাধারা ও প্রজ্ঞা দু'টিই মস্তিষ্ক প্রসূত। এখানে অহি ভিত্তিক প্রজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। -প্রধান সম্পাদক।

http://islaminonesite.wordpress.com

তাদের উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ না কর। মযলূমের আর্তনাদকে ভয় করবে। কেননা তার ও আল্লাহ্র মধ্যে কোন অন্তরায় নেই'। -*বুখারী ও মুসলিম।*

হিজরী ৯ম সালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)-কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তাঁকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়ামেন বাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ক্রমিক ধারা সম্পর্কে যে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করেছিলেন হাদীছটিতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে। ছওম ও হজ্জের কথা এতে উল্লেখ করা হয়নি। কারণ এক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)-কে ইসলামের যাবতীয় মৌলিক কার্যক্রমের বিধান স্মরণ করিয়ে দিতে চাননি। বরং তিনি তাঁকে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের ক্রমিক ধারা বুঝাতে চেয়েছিলেন মাত্র। ইসলামী আন্দোলনের দাওয়াত প্রচারের এবং তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে কোন না কোন ক্রমিক ধারা অবলম্বন করা আবশ্যক। আলোচ্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)-কে সেই ক্রমিক ধারার দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই নির্দেশের মর্মার্থ হচ্ছে ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এক সাথে সকলের সামনে পেশ করা এবং সবগুলোকে এক সঙ্গে আমলে আনার নির্দেশ প্রদান কোনক্রমেই সমীচীন হ'তে পারে না। কারণ প্রাথমিক অবস্থায় এক সাথে ইসলামের বিরাট ও বিস্তারিত আইন-কানূনকে কার্যকর করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই এ ব্যাপারে ক্রমিক ধারা এবং ক্রমিক নীতিমালা অনুসরণ অপরিহার্য। বিশেষতঃ ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্মীয় লোকদের সামনে তাওহীদ ও রেসালাতের দাওয়াত প্রচার করাই প্রথম কর্তব্য। এরপরই ছালাত ও যাকাতের নির্দেশ প্রদান করতে হবে। ইসলামী দাওয়াত প্রচারে বৈজ্ঞানিক ও ক্রমিক পর্যায় বুঝিয়ে দেয়াই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরোক্ত বাণীর মূল লক্ষ্য।

ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে ছালাত এবং যাকাতই যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা এ হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট রূপে জানা যাচ্ছে। পবিত্র কুরআনেও ছালাত এবং যাকাতের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে ব্যক্তি সঠিক ভাবে সম্পাদন করতে পারে তার পক্ষেই ইসলামী শিক্ষানুসারে জীবন যাপন সহজসাধ্য। বস্তুতঃ যে সমাজে এ দু'টি ভিত্তিগত ব্যবস্থা সঠিক ও সুষ্ঠু রূপে বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হবে সে সমাজে ইসলামের অন্যান্য যাবতীয় আমল-আচরণ তথা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধান অতি স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করবে। পক্ষান্তরে যে সমাজে এ দু'টি বুনিয়াদী ধর্মানুষ্ঠান কার্যকর হয়নি সে সমাজে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বাস্তবায়ন সহজ সাধ্য হ'তে পারে না। সম্ভবতঃ এ জন্যই পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে ছালাত ও যাকাতের নির্দেশ এক সঙ্গে দেয়া হয়েছে এবং এই দু'টি অনুষ্ঠানের উপরই মুসলিম জীবনের কর্মধারা নির্ভরশীল বলে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ইসলাম প্রচারের এবং আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের রীতিনীতি সম্পর্কে নির্দেশ দানের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)-কে যাকাত আদায়ের রীতিনীতি সম্পর্কেও উপদেশ প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে পথনির্দেশ দান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শস্য ও জন্তুর যাকাত আদায় করার সময় উৎকৃষ্ট গুলো বেছে বেছে নেয়া কিছুতেই ইসলাম সম্মত কাজ হ'তে পারে না। বরং যাকাত হিসাবে মধ্যম ধরনের সম্পদই হস্তগত করা বাঞ্ছনীয়। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত মু'আয (রাঃ)-কে মযলূমের ফরিয়াদ সম্পর্কে সতর্ক থাকার উপদেশ দিয়েছেন। কেননা মযলূমের আর্তনাদ অবিলম্বে সরাসরিভাবে আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে যায়। এমনকি মযলূম যদি পাপী এবং বিধর্মীও হয় তবুও তার ফরিয়াদ আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হয়ে যাবে।

আল্লাহ্র পথে আহবান জানাতে গিয়ে জিহাদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। তাবলীগ ও দাওয়াতের কাজে বাধা প্রাপ্ত হ'লে জিহাদে অবতীর্ণ হ'তে হবে। জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র দ্বীনের ভিত্তি সুদৃঢ় হবে এবং জান্নাতের পথ সুগম হবে।

عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم جاهدوا الناسَ فى الله تبارك و تعالى القريب والبعيد و لا تبالُوا فى الله لومة لائم و اقيموا حدود الله فى الحضر والسفر و جاهدوا فى سبيل الله فان الجهاد باب من ابواب الجنة عظيم ينجى الله تبارك و تعالى به من الغم والهم-

'হযরত ওবাদা ইব্ন ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা বরকতময় মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করে যাও এবং আল্লাহ্র ব্যাপারে কোন দুর্নামকারীর দুর্নামের বিন্দুমাত্র কোন ভয় করো না। তোমরা স্বদেশে-বিদেশে যখন যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ্র আইন ও দণ্ড বিধিকে কার্যকর করে তোল। তোমরা অবশ্যই আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে। কেননা জিহাদ হচ্ছে জান্নাতের তোরণ গুলোর মধ্যে অন্যতম একটি তোরণ দ্বার। এর মধ্য দিয়েই আল্লাহ মুজাহিদগণকে সর্বপ্রকার চিন্তা-ভাবনা ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি দান করবেন'। -*মুসনাদে আহমাদ ও বায়হাক্বী।*

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

এই হাদীছটি একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ বিশেষ। এতে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। জিহাদের প্রথম কথা হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই জিহাদ হ'তে হবে। আল্লাহ্র দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদের ক্ষেত্রে যারাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে তারা নিকটবর্তী বা দূরবর্তী যে কেউই হোক না কেন কাউকেও খাতির করা যাবে না। প্রতিবন্ধক মাত্রেরই মুকাবিলায় ইস্পাত কঠিন হয়ে দাঁড়াতে হবে। মনে রাখতে হবে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার এই জিহাদ কখনো নিষ্কন্টক এবং কুসুমাস্তীর্ণ হয় না। এ পথে প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা দেখা দেয়া অনিবার্য। এ পথে নানা প্রকার অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়ন আসবেই। এ পথে জেল, সামাজিক বয়কট ও ফাঁসির কাষ্ঠ বরণ করতে হবে। দ্বীন প্রতিষ্ঠার জিহাদ এই সকল কিছুর মধ্য দিয়ে এবং এই সকল কিছুকে অতিক্রম করেই চালিয়ে যেতে হবে। কাজেই অত্যাচার উৎপীড়নের রকম ও রূপ যাই হোক না কেন অকুণ্ঠচিত্তে বরদাশত করতে হবে। ভয়ে বিহ্বল ও ভীত সন্ত্রস্ত হ'লে এবং নির্যাতন দেখে পিছিয়ে থাকলে জিহাদ করা সম্ভব হবে না। চলতে পারবে না জিহাদের এই কণ্টকাকীর্ণ অভিযান।

আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়া একান্তই পুণ্যের কাজ। আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দিতে গিয়ে যেসব কথা বলা হয়, সেগুলো থেকে ভাল কথা আর কিছু হ'তে পারে না। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

'যে আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দেয়, সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং বলে, 'আমি মুসলিম' তার কথা অপেক্ষা উত্তম আর কার কথা হ'তে পারে?' (হামীম সাজদাহ ৩৩)।

বস্তুতঃ মানুষের সেই কথাই সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোত্তম যাতে অপরকে হকের দাওয়াত প্রদান করা হয়। আল্লাহ্র পথে আহ্বান করার মত উত্তম কথা আর কোন কথাই হ'তে পারে না। আহলেহাদীছ আন্দোলনের কর্মী হিসাবে আমাদের প্রত্যেককেই আল্লাহ্র পথে দাওয়াতের গুরু দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হ'তে হবে। কথায়, কলমে এবং অন্য যেকোন পদ্ধতিতে সম্ভব হকের দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন- আমীন!!

ঈদে কুরবান ও আমাদের করণীয়

*-এস, এম, আব্দুল লতিফ**

বিশ্ব নিয়ন্তা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত এর উদ্দেশ্যে। আমাদের জীবনের প্রতিটি ইবাদত হবে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী। আল্লাহপাক এরশাদ করেন-

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

'রাসূল (ছাঃ) তোমাদের নিকটে যা নিয়ে এসেছেন (অহি) তা গ্রহণ কর আর তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন কর' (হাশর ৭)। অপরদিকে আমাদের যাবতীয় ইবাদত খালেছ নিয়তে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ্র জন্য নিবেদিত হ'তে হবে। আল্লাহ বলেন-

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

'তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠ ভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করবে' (বাইয়েনাহ ৫)।

আরবী 'কুরবান' (قربان) শব্দটি ফারসী বা উর্দুতে কুরবানী রূপে পরিচিত হয়েছে, যার অর্থ নৈকট্য। পারিভাষিক অর্থে কুরবান ঐ মাধ্যমকে বলা হয়, যার দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা হয় (আল কামুস)। প্রচলিত অর্থে ঈদুল আযহার দিন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয়, তাকে কুরবানী বলা হয়। সকালে সূর্য উপরে ওঠার সময়ে কুরবানী করা হয় বলে এই বিশেষ আনন্দের দিনটিকে 'ইয়াওমুল আয্হা' বলা হয়।[১]

কুরবানীর ইতিবৃত্তঃ হযরত আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র কাবীল ও হাবীল -এর দেওয়া কুরবানী থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের গোড়াপত্তন হয়েছে। আল্লাহ বলেন-

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ-

'প্রত্যেক জাতির জন্য আমরা কুরবানীর নিয়ম ধার্য করেছি. যাতে তারা আল্লাহ্র দেওয়া চতুষ্পদ জন্তু যবহ করায় সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করে' (হজ্জ ৩৪)। তবে সেই সব কুরবানীর নিয়ম-কানুন আমাদেরকে জানানো হয়নি। মুসলিম উম্মাহ্র উপরে যে কুরবানীর নিয়ম নির্ধারিত হয়েছে, তা মূলতঃ ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র

---

* সাবেক সহ-সভাপতি, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'।

১. নায়ল (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৬/২২৮ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্র রাহে কুরবানী দেওয়ার অনুসরণে 'সুন্নাত' হিসাবে চালু করা হয়েছে।[২] যা মুক্বীম ও মুসাফির সর্বাবস্থায় পালনীয়।[৩] আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) মদানী জীবনে দশ বছর নিয়মিত কুরবানী করেছেন।[৪]

কুরবানীর গুরুত্বঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন- مَنْ وَجَدَ سعة فلم يَضَحِّ فلا يَقْرَبَنَّ مصلانا– رواه احمد وابن ماجه 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' (নায়লুল আওত্বার ৬/২২৭)। অনুরূপভাবে বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জন মণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে তিনি এরশাদ করেন-

يا ايها الناس ان على كل اهل بيت فى كل عام اضحية وعتيرة... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়েছে।[৫]

অতএব মুসলিম ভাতৃমণ্ডলীর উচিৎ পরিবারের পক্ষ হ'তে সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতি বছর একটি করে কুরবানী প্রদান করা।

আমাদের করণীয়ঃ

ঈদে কুরবান উপলক্ষে আমাদের করণীয় হ'ল-

(১) চুল, নখ না কাটাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[৬] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে এটি করলে আল্লাহ্র নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।[৭]

(২) কুরবানীর পশুঃ কুরবানীর পশু আট প্রকার (১) ভেড়া বা দুম্বা (২) ছাগল (৩) গরু (৪) উট, প্রত্যেকটির নর ও মাদি (আন'আম ১৪৪-৪৫)। গরুর ন্যায় মহিষের যাকাতের উপরে কিয়াস করে অনেকে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।[৮]

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন যে, উপরে বর্ণিত আট প্রকার ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী হবে না।[৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় থাকাকালীন সময়ে উট, গরু পাওয়া সত্ত্বেও সর্বদা দুম্বা কুরবানী দিতেন।[১০] ইসমাঈলের বিনিময়ে জান্নাতী পশুর যে কুরবানী দেওয়া হয়, সেটাও ভাই ছিল। তাছাড়া মানুষের ব্যবহারিক জীবনে উট-গরুর চেয়ে ছাগল-দুম্বা-ভেড়ার প্রয়োজনীয়তা অনেক কম এবং তা অধিকাংশের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। তবে রক্ত প্রবাহিত করার বিবেচনায় জমহুর বিদ্বানগণের নিকটে উত্তম হ'ল উট। অতঃপর গরু অতঃপর ভেড়া বা দুম্বা অতঃপর ছাগল।[১১]

'খাসী' কুরবানী নিঃসন্দেহে জায়েয বরং উত্তম। কেননা অন্য এক বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূল (ছাঃ) নিজে মদীনায় মুক্বীম এমনকি মুসাফির অবস্থায়ও সর্বদা 'খাসী' কুরবানী দিতেন।[১২] ইবনু হাজার বলেন, 'খাসী কুরবানী জায়েয। যদিও অন্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে কেউ কেউ এটাকে খুঁৎওয়ালা পশু বলে অপসন্দ করেন। কিন্তু মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়। বরং এর ফলে গোস্ত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয়।[১৩]

কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ পশু এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা জন্তুর দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ নয়।[১৪] এসবের চাইতে নিম্নস্তরের কোন দোষ যেমন অর্ধেক লেজ কাটা ইত্যাদি থাকলে তার দ্বারাও কুরবানী হবে না। তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে।[১৫]

অতএব আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উপরোল্লেখিত আট প্রকার পশুর মধ্য থেকে সুস্থ সবল যেকোন একটি পশু কুরবানীর জন্য নির্বাচন করা যরূরী।

(৩) 'মুসিন্নাহ' পশু দ্বারা কুরবানী করাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন-

لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان رواه مسلم

অর্থঃ 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর

---

২. নায়ল ৬/২২৮।
৩. কুরতুবী (বৈরুতঃ ১৯৮৫) ১৫/১০৯।
৪. তিরমিযী, মিশকাত (বৈরুতঃ ১৯৮৫) হা/১৪৭৫।
৫. মিশকাত হা/১৪৭৮।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯।
৭. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯, হাকেম (বৈরুতঃ তাবি) ৪/২২৩, সনদ ছহীহ।
৮. মির'আত ২/৩৫৩-৫৪।
৯. কিতাবুল উম্ম (বৈরুতঃ তাবি) ২/২২৩ পৃঃ।
১০. শাওকানী, আস-সায়লুল জাররার (বৈরুতঃ তাবি) ৪/৮৮, সুবুল ৪/১৮৫, কুরতুবী ১৫/১০৭)।
১১. নায়ল ৬/২৩৫।
১২. মিশকাত হা/১৪৬১; আলবানী ইরওয়াউল গালীল (বৈরুতঃ ১৯৮৫) ৪/৩৫১ সনদ হাসান।
১৩. ফাৎহুলবারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ১৮/১২ পৃঃ।
১৪. মিশকাত হা/১৪৬৫, ৬৩, ৬৪; তুহফা ৫/৯০ পৃঃ।
১৫. মির'আত ২/৩৬৩, ফিকহুস সুন্নাহ (জেদ্দাঃ ১৯৮৪) ১/৭৩৮ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[১৬] জমহুর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য উত্তম হিসাবে গণ্য করেছেন।[১৭] 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[১৮] কেননা এই বয়সে সাধারণঃ এই সব পশুর নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত উঠেনা। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের নয়। তাই কুরবানী করার সময় আমাদিগকে পশু 'মুসিন্নাহ' কিংবা বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছে কি-না দেখে কুরবানী করতে হবে। যাতে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী কুরবানী করতে সক্ষম হই।

(৪) নিজের কুরবানীর সাথে পরিবারের সবাইকে সম্পৃক্ত করাঃ

(ক) আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দেওয়া হ'লে তা পরিবারের নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তির নামে দেওয়া হয়। এতে পরিবারের বাকী সদস্যগণ কুরবানীর ছওয়াব থেকে মাহরূম হচ্ছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর একটি কুরবানীতে নিজের, নিজ পরিবারের ও সমস্ত উম্মতে মুহাম্মাদীর কথা উল্লেখ করেছেন। যা নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হব।-

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একটি শিং ওয়ালা সুন্দর সাদা কালো দুম্বা আনতে বললেন....অতঃপর দো'আ পড়লেন-

بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن امة محمد

'বিসমিল্লাহ; হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও উম্মতের পক্ষ হ'তে। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[১৯]

(খ) একই মর্মে ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) প্রমুখাৎ ছহীহ সনদে বর্ণিত ইবনু মাজাহ্‌র একটি হাদীছ (হাদীছ নং ২৫৪৭) উদ্ধৃত করে ইমাম শাওকানী বলেন, 'একটি ছাগল একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারের সদস্য শতাধিক হয়'।[২০]

(গ) মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, যারা একটি ছাগল একজনের জন্য নির্দিষ্ট বলেন এবং উক্ত হাদীছ গুলিকে একক ব্যক্তির কুরবানীতে পরিবারের সকলের ছওয়াবে অংশীদার হওয়ার 'তাবীল' করেন বা খাছ হুকুম মনে করেন কিংবা হাদীছগুলিকে 'মানসূখ' বলতে চান, তাদের এই সব দাবী প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী এবং তা প্রত্যাখ্যাত ও নিছক দাবী মাত্র'।[২১]

(ঘ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ পরিবার ও নিজ উম্মতের পক্ষ হ'তে এক ও একাধিক দুম্বা, খাসী, বকরী (ছাগল), গরু ও উট কুরবানী করেছেন।[২২]

উল্লেখিত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যেহেতু একজন ব্যক্তি তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানী দিলে পরিবারের সকলের জন্যই কুরবানী হয়ে যাবে তাই কুরবানী করার সময় পরিবারের সকলের কথাই নিয়ত করা উচিত। যাতে কুরবানীর ছওয়াব থেকে কেউ বঞ্চিত না হয়।

(৫) কুরবানীতে শরীক হওয়াঃ

(ক) হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر الاضحى فاشتركنا فى البقرة سبعة وفى البعير عشرة

অর্থঃ (ক) আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাতজনে একটি গরু ও দশজনে একটি উটে শরীক হলাম।'[২৩] (খ) হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সফরে শরীক ছিলাম।... তখন আমরা একটি গরু ও উটে সাতজন করে শরীক হয়েছিলাম।'[২৪] জমহুর বিদ্বানগণের মতে হজ্জের হাদ্‌ঈর ন্যায় কুরবানীতেও শরীক হওয়া চলবে।[২৫]

(গ) হযরত আনাস (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কায় (হজ্জের সফরে) ৭টি উট (অন্য বর্ণনায় এর অধিক) নহর করেছেন এবং মদীনায় (মুক্বীম অবস্থায়) দু'টি দুম্বা (একটি নিজের ও একটি উম্মতের পক্ষে) কুরবানী দিয়েছেন।'[২৬] অবশ্য মক্কায় নহরকৃত উটগুলি ছাহাবীদের পক্ষ থেকেও হ'তে পারে।

আলোচনাঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছটি নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনুমাজাহ্‌তে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি মুসলিম ও আবুদাউদে এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। মুসলিম ও বুখারীতে যথাক্রমে 'হজ্জ' ও 'মানাসিক' অধ্যায়ে এবং সুনানে 'উযহিয়াহ' অধ্যায়ে হাদীছগুলি এসেছে। যেমন (১) তিরমিযী 'কুরবানীতে শরীক হওয়া' অধ্যায়ে ইবনু আব্বাস, জাবির ও আলী থেকে মোট তিনটি হাদীছ এনেছেন। যার মধ্যে প্রথম দু'টি সফরের কুরবানী ও শেষেরটিতে কোন ব্যাখ্যা

---

১৬. মুসলিম, নাসাঈ তা'লীকাত সহ (লাহোরঃ তাবি) ২/৯৬।
১৭. মির'আত ২/৩৫২।
১৮. মির'আত ২/৩৫২।
১৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।
২০. নায়ল ৬/২৪৪।
২১. মির'আত ২/২৫১।
২২. মিশকাত হা/১৪৫৩, ৬১, ৫৬-ফাৎহ ১০/৯ পৃঃ ৫৭-মিরআৎ ২/৩৫৪ পৃঃ।
২৩. মিশকাত হা/১৪৬৯, সনদ ছহীহ।
২৪. মুসলিম (বৈরুতঃ ১৯৮৩) হা/১৩১৮।
২৫. মির'আত ২/৩৫৫।
২৬. বুখারী (মীরাটঃ ১৩২৮ হিঃ) ২৩১ পৃঃ।

নেই।[২৭] (২) ইবনু মাজাহ উক্ত মর্মের শিরোনামে ইবনু আব্বাস, জাবের, আবু হুরায়রা ও আয়েশা হ'তে যে পাঁচটি হাদীছ (৩১৩১-৩৪ নং) এনেছেন, তার সবগুলিই মুসাফিরের কুরবানী সংক্রান্ত। (৩) নাসাঈ কেবলমাত্র ইবনু আব্বাস ও জাবির থেকে পূর্বের দু'টি হাদীছ (২৩৯৭-৯৮ নং) এনেছেন। (৪) আবুদাঊদ শুধুমাত্র জাবির-এর পূর্ব বর্ণিত সফরে কুরবানীর হাদীছটি এনেছেন তিনটি ছহীহ সনদে (২৮০৭-৯ নং), যার মধ্যে ২৮০৮ নং হাদীছটিতে (البقرة عن سبعة والجزورعن سبعة) কোন ব্যাখ্যা নেই।

ভাগা কুরবানীঃ মিশকাত শরীফে ইবনু আব্বাস-এর হাদীছটি (নং- ১৪৬৯) এবং জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটি (নং ১৪৫৮) সংকলিত হয়েছে। সম্ভবতঃ জাবির বর্ণিত ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিকে ভিত্তি করে এদেশে মুক্বীম অবস্থায় গরুতে সাত ভাগা কুরবানীর প্রথা চালু হয়েছে। অথচ ভাগের বিষয়টি সফরের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যা ইবনু আব্বাস ও জাবির বর্ণিত বিস্তারিত হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। আর একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দলীলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণেরর সর্ববাদীসম্মত রীতি।

তাছাড়া মুক্বীম অবস্থায় মদীনায় আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম ভাগে কুরবানী করেছেন বলেও জানা যায় না। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে এদেশে কেবল সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয় বরং সাত পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী দেওয়া হচ্ছে।

পরিশেষেঃ যদি কেউ বলেন, মুক্বীম অবস্থায় ভাগা কুরবানীর ব্যাপারে তো কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। উত্তরে বলা চলে যে, 'কুরবানী' হ'ল ইবাদত। ইবাদতের মূল বিষয় হ'ল 'নিষিদ্ধতা'। অর্থাৎ যে ইবাদত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছেন, তা করতে হবে; যা করেননি, তা করা নিষেধ। এক্ষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যদি প্রচলিত সাত ভাগা কুরবানী করে থাকেন, তবে দেশে চালু আছে বলেই তা করা যাবে না। বরং তা ছেড়ে দিতে হবে। দেখা যাচ্ছে যে, এ ব্যাপারে রাসূলের কোন নির্দেশ বা আমলও নেই। অতএব ইবরাহীমী ও মুহাম্মাদী সুন্নাত অনুসরণে নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে আল্লাহ্র রাহে একটি পূর্ণাংগ জীবন কুরবানী দেওয়া উচিত-জীবনের কোন খণ্ডিত অংশ নয়।

'কুরবানী ও আকীকা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা'- এই (ইস্তিহ্সানের) যুক্তি দেখিয়ে কিছু কিছু হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আকীকা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এ দেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[২৮] ইমাম আবু ইউসুফ এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরীয়ত। এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[২৯] বলা আবশ্যক যে, কুরবানীর পশুতে আকীকার ভাগ নেওয়ার কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের কথা ও কর্মে পাওয়া যায় না। এটি সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত।

(৬) কুরবানী করার নিয়মঃ

(ক) উট বাদে গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলতে হবে।[৩০] অতঃপর কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে কেবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজ ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন।[৩১]

(খ) অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় প্রত্যক্ষ করা উত্তম।

(গ) যদি কেবলামুখী হ'তে ভুলে যান, তাহলেও দোষ নেই।[৩২]

(ঘ) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[৩৩]

(৭) যবহকালীন দো'আ ঃ (১) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবর। (২) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (অর্থঃ আল্লাহ্র নামে। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন .... মিন ফুলান বায়তিহী' (অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ।[৩৪] (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবর, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (... হে আল্লাহ তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইব্রাহীমের পক্ষ থেকে)।[৩৫] (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[৩৬] (৫) উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে।

(৮) কুরবানীর গোস্ত বন্টনের নিয়মঃ কুরবানীর গোস্ত এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ

২৭. তিরমিযী তুহ্ফাসহ হা/১৫৩৭-৪০, ৫/৮৭-৮৮ পৃঃ।
২৮. হেদায়া, কুরবানী অধ্যায় (দিল্লীঃ ১৩৫৮ হিঃ) ৪/৪৩৩; বেহেশতী জেওর, আকীকা অধ্যায় (ঢাকাঃ এমদাদিয়া ১০ মুদ্রণ ১৯৯০) ১/৩০০।
২৯. নায়ল, আকীকা অধ্যায় ৬/২৬৮।
৩০. সুবুল ৪/১৭৭, মির'আত ২/৩৫১ প্রভৃতি।
৩১. নায়ল ৬/২৪৫-৪৬।
৩২. উম্ম ২/২২৩ পৃঃ।
৩৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৯।
৩৪. *মিরকাত ২/৩৫০।*
৩৫. ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ (কায়রোঃ ১৪০৪ হিঃ ২৬/৩০৮।
৩৬. মুগনী (বৈরুতঃ তাবি) ১১/১১৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়-বন্ধুদের খাওয়ানোর জন্য ও এক ভাগ ছাদকা করার জন্য মোট তিন ভাগ করা উত্তম। কুরবানীর গোস্ত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৩৭]

(৯) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোস্ত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৩৮]

(১০) কুরবানীদাতার আমলঃ কুরবানীদাতা সকাল হ'তে কুরবানীর আগ পর্যন্ত কিছুই খাবেন না।[৩৯] বরং কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করবেন।[৪০]

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমাদের কুরবানী দুনিয়াবী স্বার্থে কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে না হয়ে যেন কেবলমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়। নচেৎ এই কুরবানী আমাদের জন্য পরকালে কোন কল্যাণ বয়ে আনবে না। কুরবানী পশুর গলায় ছুরি চালানোর আগে নিজের পশু প্রকৃত্তির গলায় ছুরি চালাতে পারলেই আমাদের কুরবানী সার্থক হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

[হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'মাসায়েলে কুরবানী' বই থেকে সংকলিত। -লেখক]

৩৭. সুবুল ৪/১৮৮, মুগ্নী ১১/১০৮।
৩৮. মুগনী ১১/১২০।
৩৯. তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ।
৪০. বায়হাক্বী, মিরআত ২/৩৩৮।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহীর জন্য একজন ক্বারী ও একজন শরীর চর্চা শিক্ষক আবশ্যক।

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

১. ক্বারীর জন্য দাখেল মুযাব্বিদ।
২. শরীর চর্চা শিক্ষকের জন্য বিপিএড থাকতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সাক্ষাতকারের জন্য দরখাস্ত ও মূল সনদপত্র সহ আগামী ৮ই এপ্রিল সকাল ১০ ঘটিকার সময় মারকায অফিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ প্রার্থীগণকে নিয়মিত ছালাত আদায়কারী এবং সুন্নাতের পাবন্দ হ'তে হবে।

অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মওযূ ও যঈফ হাদীছের প্রচলন

মূলঃ শাম্স পীরযাদা
ভাষান্তরঃ আব্দুর রায্যাক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে হজ্জ' -এ হযরত আদম (আঃ) কর্তৃক নবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে দো'আ করার আজব ও বিরল রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে।

'হাকিম রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন এবং এটিকে ছহীহ বলেছেন যে, যখন হযরত আদম (আঃ)-এর গন্দম খাওয়ার দোষ প্রকাশিত হ'ল তখন তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট হুযূর (ছাঃ)-এর মাধ্যমে দো'আ করলেন। আল্লাহ জাল্লাশানুহু বললেন যে, 'হে আদম! তুমি কি করে এটা জানলে, আমি তো তাকে এখনো পয়দাই করিনি?' তখন আদম (আঃ) বললেন, 'হে আল্লাহ! যখন আপনি আমাকে পয়দা করেছিলেন এবং আমার মধ্যে প্রাণ দিয়েছিলেন তখন আমি আরশের গায়ে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা দেখেছিলাম এবং বুঝেছিলাম যে, আপনি নিজের পবিত্র নামের সাথে যার নাম যুক্ত করেছেন সে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আপনার সবচেয়ে বেশী প্রিয় হবে।' আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'নিশ্চয় সে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশী প্রিয় এবং যখন তুমি তার মাধ্যমে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ তখন আমি তোমার দোষ ক্ষমা করে দিলাম' (ফাযায়েলে হজ্জ, পৃষ্ঠা- ১১৫)।

আল্লামা আলবানী লিখেছেন, এই হাদীছ যাল এবং ইমাম যাহাবী এটাকে 'খবরে বাত্বিল' বলে ঘোষণা করেছেন (সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফা, জিল্দ ১, পৃষ্ঠা ৩৮)।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন, হাকিমের এই হাদীছকে মুনকার বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কেননা এর একজন রাবী আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম, যার সম্বন্ধে হাকিম নিজেই তাঁর কিতাব 'আল-মুদাখিল' -এ লিখেছেন যে, সে তার পিতার নিকট থেকে যাল হাদীছ বর্ণনা করে। হাদীছের আলেমরা বলেন যে, হাকিম এমন হাদীছগুলোও ছহীহ বলে স্বীকার করেন, যা মুহাদ্দিছদের নিকট যাল ও মিথ্যা বলে গণ্য। (ইবনে তাইমিয়া, মাজমূ'আ ফাতাওয়া জিল্দ ১, পৃষ্ঠা ২৫৪)।

এই রেওয়ায়াতের বাতিল হওয়া তার বক্তব্য থেকেও প্রমাণিত হয়। কেননা কুরআন করীমে হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা হিসাবে যে দো'আর বর্ণনা করা হয়েছে তার ভাষা হ'ল এই যে -

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ। 'হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের উপর যুলূম করেছি যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না করো এবং দয়া না করো তাহ'লে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব' (আ'রাফ ২৩)।

http://islaminonesite.wordpress.com

এই দো'আতে এ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই যে, হযরত আদম (আঃ) ক্ষমা লাভের জন্যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দোহাই দিয়েছিলেন। যদি এমন হ'ত তাহ'লে এত গুরুত্বপুর্ণ কথা কুরআন কি করে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকত? সুতরাং এ রেওয়ায়াত কুরআনের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেসব লোকেরা ওয়াস্তাহ ও অসীলার বিদ'আত বের করেছে তারা এ ধরনের রেওয়ায়াতের আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা কুরআন থেকে কোন যুক্তি পায় না এবং প্রামাণ্য সুন্নাত থেকেও পায় না বরং যঈফ ও যাল হাদীছ গুলো থেকেই তারা যুক্তি যোগাড় করে।

(১১) তাবলীগী নিসাবের 'ফাযায়েলে হজ্জ' -এ মানযারীর কিতাব তারগীবের সূত্র থেকে এই রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 'হযরত আদম (আঃ) ভারত থেকে পায়ে হেঁটে এক হাযার বার হজ্জ করেছেন' (ফাযায়েলে হজ্জ, পৃঃ ৩৫)।

এর একজন রাবী কাসেম বিন আবদুর রহমান। এর সম্বন্ধে ইয়াহ ইবনে মুঈন বলেন যে, সে কিছুই নয় (অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য নয়) এবং আবু যাররা বলেন, সে মুনকার হাদীছ বর্ণনা করে। এর অন্য রাবী আব্বাস বিন ফযল আনসারীর সম্বন্ধে আল্লামা আলবানী বলেছেন যে, সে মাতরূক (পরিত্যক্ত)। আবু যাররাহ তাকে মুতাহ্হিম বলে ঘোষণা করেছেন।

(সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফা জিল্দ-১, পৃঃ ৩০৩)।

কুরআন হযরত ইবরাহীম (আঃ) -কে কা'বার নির্মাতা হিসাবে পেশ করেছে। হযরত আদম (আঃ)-এর যুগে খানায়ে কা'বার অস্তিত্বই বা কোথায় ছিল যে তিনি হজ্জ করতেন। হযরত আদম (আঃ)-এর ভারতে অবতীর্ণ হওয়াটাও কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় এবং এ ব্যাপারটা তো একটা মু'জেযাই হ'তে পারে যে, তিনি ভারত থেকে পায়ে হেঁটে এক হাযার বার হজ্জ করেন। কিন্তু মু'জেযাহ প্রমাণিত হওয়ার জন্য রেওয়ায়াত দৃঢ় হওয়া দরকার। নির্ভর যোগ্য নয় এমন রাবীদের বর্ণনা থেকে কোন মু'জেযাহ প্রমাণিত হয় না। সেজন্যে এই রেওয়ায়াত সম্পূর্ণ যাল ও মুনকার।

(১২) 'পবিত্র কবরের স্থানটি সমগ্র স্থান অপেক্ষা ভাল। যে অংশ হুজুরের শরীরের সাথে যুক্ত হয়েছে তা কা'বার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আরশের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং কুরসীর চেয়েও শ্রেয়তর। এমনকি আসমান ও জমীনের সর্বস্থানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

(তাবলীগী নিসাব, ফাযয়েলে হজ্জ, পৃঃ ১০৯)

এতবড় একটা দাবি বিনা প্রমাণে করা হয়েছে। এ কথা না কুরআনের কোথাও বর্ণিত হয়েছে আর না কোন ছহীহ হাদীছে পাওয়া যায়, তাহ'লে লেখক এটা কিভাবে জানলেন? দ্বীনের ব্যাপারে কি এ রকম বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলা জায়েয? কবরের স্থানটি কা'বা, আরশ ও কুরসীর চেয়ে উৎকৃষ্ট হওয়া খোলাখুলি ভাবে বিতর্ক সৃষ্টিকারী ও নিকৃষ্ট ধরনের ভুল। এ ধরনের কথা বলা থেকে বিরত থাকা উচিৎ, যা নবীর মর্যাদাকে আল্লাহ্‌র চেয়ে বাড়িয়ে দেয়।

(১৩) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা বর্ণনা করছেন যে, 'আমার বর্তিকা এবং যে ব্যক্তি জুম'আর দিন আমার উপর আশি বার দরূদ পড়বে তার আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।

(তাবলীগী নিসাব, ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, পৃঃ ৪০)।

লেখক লিখেছেন, 'আল্লামা সাখাবী (রঃ) 'কওলে বাদী'-তে বিভিন্ন রেওয়ায়াত, যাদের যঈফ বলা হয়েছে তা থেকে উদ্ধৃত করেছেন।'

এই হাদীছ শুধু যঈফ নয় বরং আল্লামা আলবানী যেমন ব্যাখ্যা করেছেন, সে অনুসারে যালও বটে। (সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফা জিল্দ-১, পৃঃ ২৫১)

এই হাদীছটি যাল হওয়ার প্রমাণ এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই রয়েছে। কেননা এতে জুম'আর দিন আশি বার দরূদ পড়ার পুরস্কার এই বলা হয়েছে যে, আশি বছরের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। অথচ কুরআনে বলা হয়েছে-

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا (الانعام ١٦٠)

'যে এক নেকি নিয়ে আসবে তার জন্যে দশগুণ পুরস্কার' (আন'আম ১৬০)।

এবং ছহীহ হাদীছে একবার দরূদ পড়লে দশগুণ ছওয়াবের কথা বলা হয়েছে-

مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا (مسلم)

'যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত নাযিল করেন' (মুসলিম)।

ছওয়াবের ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করতে বিশেষত্ব রয়েছে যঈফ ও যাল হাদীছগুলোর। এ ধরনের হাদীছগুলোর মাধ্যমে দ্বীনের তাবলীগ করা ঠিক নয়। এতে দ্বীনের অবস্থা বিকৃত হয় এবং মানুষ নিজের প্রকৃত দায়িত্ব-কর্তব্য (ফারায়েয) থেকে গাফেল হয়ে পড়ে।

(১৪) তাবলীগী নিসাবে বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমান -এর সূত্র থেকে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, 'হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইরশাদ বর্ণনা করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তা শুনি এবং দূর থেকে যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পড়ে তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়।

(ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, পৃঃ ১৮)।

ইবনে জাওযী লিখেছেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। এর রাবী

http://islaminonesite.wordpress.com

মুহাম্মাদ বিন্ মুরান সিদ্দী সম্বন্ধে ইবনে নুমাইর বলেছেন যে, সে মিথ্যাবাদী এবং নাসাঈ বলেছেন যে, সে পরিত্যক্ত (কিতাবুল মাওযূ'আত জিল্দ-১, পৃঃ ৩০৩)।

আল্লামা আলবানী এটা যাল হওয়ার পক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন এবং লিখেছেন যে, ছহীহ হাদীছে শুধু এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠায় তার দরূদ তাঁর নিকট পৌঁছে দেওয়া হয় (সিলসিলাতুল আহাদীছুয যঈফা জিল্দ- ১, পৃঃ ২০৩)।

(১৫) মুসনাদ আবু ইয়ালাতে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে হুজুর আকদাস (ছাঃ)-এর ইরশাদ বর্ণনা করা হয়েছে যে, সেই গোপন যিকির, যা ফেরেশতারাও শুনতে সক্ষম নয়, তা সত্তর গুণ মূল্যবান। যখন কিয়ামতের দিন আল্লাহপাক সমস্ত মখলূককে বিচারের জন্যে সমবেত করবেন এবং কিরামান কাতিবীন আমলনামা নিয়ে আসবে, তখন ইরশাদ হবে যে, অমুক ব্যক্তির আমলনামা দেখো! আরো কিছু বাকি আছে। তারা বলবে, আমরা কিছুই অলিখিত ও অসংরক্ষিত রাখিনি। তখন ইরশাদ হবে, আমার নিকট তার এমন কিছু আমল রয়েছে, যা তোমাদের জানা নেই আর তা হলো 'যিক্রে খফী' বা গোপন যিকির' (তাবলীগী নিসাব, ফাযায়েলে যিকির পৃঃ ৪৩)।

এই হাদীছকে কুরআনের কষ্টিপাথরে যাচাই করুন, তাহ'লে এটা পরিস্কার ভাবে বাতিল বলে বুঝতে পারা যাবে। সূরা ইনফিতারে বলা হয়েছে-

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ –

'তোমাদের উপর নজরদার নিযুক্ত আছে কিরামান কাতিবীন। তোমরা যা করো তা তারা জানে'।

কিন্তু এই হাদীছ বলছে যে, 'যিকিরে খফী' কেরামান কাতিবীনের নিকটও গোপন থেকে যায়। সূরা কাহাফে ইরশাদ হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন লোকেরা নিজেদের আমলনামা দেখে বলবে-

مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا

'এটা কেমন কিতাব যে, ছোট বা বড় কোন ব্যাপারই এ থেকে বাদ যায়নি বরং সব জিনিসই লিপিবদ্ধ করে রেখেছে!'

এইভাবে কুরআন ব্যাখ্যা করে বলছে যে, কোন ক্ষুদ্রতম কাজও আমলনামা বহির্ভূত নয়। কিন্তু উল্লেখিত হাদীছ বলছে যে, 'যিক্রে খফী' আমলনামার বাইরে রয়ে গিয়েছিল এবং তা লেখক ফেরেশতাদের জানা ছিল না। এমন হাদীছকে যদি যাল ও বাতিল না বলা হয় তাহ'লে আর কি বলা হবে?

(১৬) মাকামে মাহমূদের ব্যাখ্যা এইভাবে করা হয়েছেঃ- 'কেউ কেউ বলেন যে, আল্লাহ জাল্লাশানুহু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কিয়ামাতের দিন আরশের উপর এবং কারো মতে কুরসীর উপর বসাবেন' (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, পৃঃ ৪৬)

এ কথা যেই বলুক সে অত্যন্ত ঔদ্ধত্ব সহকারে নিকৃষ্টতম মিথ্যা আল্লাহ্র প্রতি আরোপ করেছে। নবী (ছাঃ)-কে এত উঁচুতে তোলা হয়েছে যে, তাঁকে আরশ ও কুরসীতে বসানো হবে বলা হয়েছে। যা খুবই ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা এবং এতে তাওহীদ বিশ্বাস আহত হয়। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, মুসলমানদের ইছলাহ্ করার জন্যে যে কিতাব লেখা হয় তাতে এই রকম ভিত্তিহীন বেপরওয়া কথা উদ্ধৃত করা হয়! যখন আক্বীদারই সংশোধন হল না তখন আর কি সংশোধন হ'তে পারে? এইসব কথা তো বাতিল করার জন্যে উল্লেখ করা যেতে পারে তাবলীগ বা প্রচার করার জন্যে নয়।

ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে উক্ত কথাকে দলীল সহকারে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং শেষে লিখেছেন, 'সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, এ কথা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও বাতিল। এর দিকে ঐ ব্যক্তিই আকৃষ্ট হ'তে পারে যার না বিবেক বুদ্ধি আছে আর না দ্বীনের জ্ঞান আছে। আল্লাহ ভালো জানেন' (তাফসীরে কবীর, জিল্দ- ২১, পৃঃ ৩২)।

মূলতঃ এই কথাটিকে মুজাহিদের প্রতি আরোপ করা হয়েছে, যিনি একজন বিশিষ্ট তাবেঈ ও মুফাসসির। এরকম অর্থহীন কথা তিনি কিরূপে বলতে পারেন! কিন্তু দায়িত্বহীন রাবীরা মিথ্যা তৈরী করে তাঁর নামে প্রচার করেছে। সুতরাং তাফসীরে তাবারীতে এই রেওয়ায়াত উবাদ বিন্ ইয়াকুব আসদী থেকে বর্ণিত হয়েছে (তাফসীরে তাবারী, জিল্দ- ৮, পৃঃ ৯)। এবং উবাদ বিন্ ইয়াকুব আসদীর সম্বন্ধে জানা যায় যে, সে শিয়া ও প্রচণ্ড ধরনের বিদ'আতী ছিল। আসমাউর রিজালের গ্রন্থ 'তাহযীবুত তাহযীব' -এ হাফেয ইবনে হাজার, ইবনে আদী'র উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, ইবাদের মধ্যে শিয়া মনোভাবের প্রাধান্য ছিল আর সে ফযীলতের ব্যাপারে মুনকার রেওয়ায়াত বর্ণনা করত। এইভাবে ইবনে হিব্বানের কথা নকল করেছেন যে, তিনি রাফেযী ছিলেন এবং মুনকার রেওয়ায়াত প্রখ্যাত রাবীর হাওয়ালা দিয়ে বর্ণনা করতেন। তাই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

(তাহযীবুত তাহযীব, জিল্দ ৫, পৃঃ ১০৯)।

এ কথা পরিষ্কার হ'ল যে, উল্লেখিত রেওয়ায়াতগুলো সনদের দিক থেকে গ্রহণের অযোগ্য এবং বক্তব্যের দিক থেকেও ভ্রান্ত। এ ধরনের রেওয়ায়াত ও উক্তিসমূহ সংশোধন ব্যতীত সাধারণ লোকের নিকট পেশ করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ।

[চলবে]

http://islaminonesite.wordpress.com

ছাহাবা চরিত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)

*-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, নিরলস প্রচেষ্টা, অবিরাম সাধনা ও অধ্যবসায়ের ফলে ইলমে হাদীছ ও ইলমে তাফসীরের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। জ্ঞান ও মর্যাদার দিক দিয়ে তিনি সেসব ছাহাবীদের প্রথম সারিতে ছিলেন যাঁরা দ্বীনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে গভীর সমুদ্র হিসাবে বিবেচিত হ'তেন। শৈশব কাল থেকেই রাসূল (ছাঃ)-এর সান্নিধ্য লাভ এবং ওমর ফারূক (রাঃ)-এর মত অভিজ্ঞ পিতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ফলে জ্ঞান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হয়েছিলেন তিনি। দুনিয়ার চেয়ে আখেরাতকেই তিনি বেশী অগ্রাধিকার দিতেন। যার ফলে অঢেল পার্থিব বিত্ত-বৈভব লাভের সুযোগ এবং খিলাফতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার লোভনীয় প্রস্তাবও নিঃসঙ্কোচে প্রত্যাখ্যান করেছেন। জাগতিক সকল প্রকার ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকে একনিষ্ঠ ভাবে দ্বীনের খেদমত করেছেন। তাক্বওয়ার গণ্ডির মধ্যেই সর্বদা নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এই প্রখ্যাত ছাহাবীর জীবন চরিত সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।-

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ নাম আব্দুল্লাহ, পিতার নাম ওমর,[১] মাতার নাম যয়নব বিনতে মায'উন, যিনি বনু জুমাহ গোত্রের লোক ছিলেন।[২] তাঁর উপাধি আবু আব্দির রহমান।[৩] এ নামে তিনি অধিক পরিচিত।[৪] পূর্ণ বংশ ধারা হ'লঃ আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্ত্বাব বিন নুফায়েল বিন আব্দুল উয্যাহ বিন রাবাহ বিন কুরত বিন জারাহ বিন আদি বিন কা'ব বিন লুব্বী[৫] 'আল-কারাশী আল-আদবী।[৬]

জন্ম ও শৈশবঃ তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি। তবে নবুঅতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় বৎসর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেননা বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর। আর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল নবুঅতের ১৫ বছর পর।[৭] নবুঅতের ছয় বছর পর স্বীয় পিতা হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর সাথে (প্রায়) পাঁচ বছর বয়সে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ১১ বছর বয়সে তিনি স্বীয় পিতা ও নিজ পরিবারের সাথে মদীনায় হিজরত করেন।[৮]

দৈহিক গঠনঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) আকার-আকৃতিতে স্বীয় পিতার মতই ছিলেন।[৯] লম্বা দেহ, গমের মত বর্ণ, হৃষ্ট-পুষ্ট শরীর, কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল তাঁর। চুলে হলুদ খেযাব লাগাতেন তিনি।[১০]

আচার-ব্যবহারঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন উত্তম চরিত্র ও মহৎ ব্যাক্তিত্ব সম্পন্ন এক মহামানব। তাঁর মধ্যে বহুবিধ গুণের অপূর্ব সমাহার ঘটেছিল। রাসূল প্রেম, সুন্নাহ্র অনুসরণ, আল্লাহ ভীতি, জিহাদ ও ইবাদতের প্রতি উৎসাহ, বদান্যতা ও আত্মত্যাগ, বিনয়, মুখাপেক্ষীহীনতা, অল্পে তুষ্টি, সহজ সরলতা, হক বলা ও স্পষ্টবাতিদা ইত্যাদি অগণিত গুণে গুণান্বিত ছিলেন তিনি।[১১]

শিক্ষা জীবনঃ রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় অধিকাংশ সময় হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর সান্নিধ্যে কাটানোর চেষ্টা করতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অধিকাংশ ইলমী আলোচনা বৈঠকেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। যেদিন কোন কারণে তাঁর দরবারে উপস্থিত থাকতে পারতেন না সেদিনের হাদীছগুলো উপস্থিত অন্যান্য ছাহাবীদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিতেন ও মুখস্ত করতেন।[১২] যারর ফলে তিনি হাদীছের অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মহানবী (ছাঃ)-এর ওফাতের পর তিনি ৬২ বছর বেঁচে

---

* দ্বিতীয় বর্ষ (সম্মান) ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাক্বরীবুত তাহযীব (দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, ২য় সংস্করণ, ১৪০৮/১৯৮৮) পৃঃ ৩১৫; Encyclopeadia of Islam, (Leiden, New edition 1979), v-1. p-53.

২. তালিবুল হাশেমী, বিশ্বনবীর সাহাবী, অনুবাদঃ আব্দুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হিঃ/১৪০০ বাং/১৯৯৪ইং) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮।

৩. হাফেয আবুল ফিদা ইবনু কাছীর আদ্দামেশক্বী, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান, ১ম প্রকাশ, ১৪০৮ হিঃ/১৯৮৮ ইং) ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫।

৪. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ ইং/১৩৯২ বাং) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৯।

৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬৮; ইবনু হাজার এভাবে বর্ণনা করেন, عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدى

দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৫ হিঃ/১৯৯৪ ইং), ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১।

৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড (জুয), পৃঃ ৫।

৭. হাফেয আবুল আলা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দির রহমান আল-মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ ইং) ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃঃ ২২১।

৮. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৮-৬৯; ইবন শিহাব বলেন, ইবনে ওমর তাঁর পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন।
দ্রঃ হাকিম নিশাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হিঃ/১৯৯০ইং), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।

৯. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬।

১০. হাফেয জামালুদ্দীন আবিল হাজ্জাজ, তুহফাতুল আশরাফ বি মা'রেফাতিল আত্ত্বরাফ (তুণ্ডিমাবাদি, ভারতঃ আদ্দারুল ক্বাইয়েমা, ২য় প্রকাশ ১৪০৩ হিঃ/১৯৮২ ইং), ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভুমিকা, পৃঃ ৭।

১১. The Encyclopeadia of Islam, v-1. p-54.

১২. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ফী তামযীযিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

ছিলেন এবং হাদীছ প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ ক ছিলেন।[১৩] সাথে সাথে কুরআন কারীমের তাফসীরের ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। তিনি ফিক্হ শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। হযরত ইবনে কাইয়ূম (রঃ) বলেছেন, 'হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রদত্ত ফৎওয়া যদি একত্রিত করা হয় তাহ'লে এক বিশাল আকৃতির পুস্তক তৈরী হ'তে পারে'। দ্বীনি ইলম ছাড়া আরবী ভাষা ও সাহিত্যেও তিনি প্রভূত দখল রাখতেন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সময় ব্যয় করা তিনি পসন্দ করতেন না।

শিক্ষক মণ্ডলীঃ মহানবী (ছাঃ) সহ অনেক ছাহাবী তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে তাঁর পিতা ওমর ফারূক (রাঃ), চাচা যায়েদ (রাঃ), বোন হাফসাহ (রাঃ), আবুবকর, ওছমান, আলী, সাঈদ, বিলাল, যায়েদ ইবনে ছাবেত, ছুহাইব, ইবনু মাস'ঊদ, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এবং রাফে' ইবনে খাদিজ প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪]

ইলমে হাদীছে অবদানঃ হাদীছ বর্ণনায় আধিক্যের দিক দিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর স্থান ছিল দ্বিতীয়। তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ২৬৩০ টি।[১৫] কেউ কেউ বলেন তিনি ১৬৩০ টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[১৬] এর মধ্যে ১৭০টি হাদীছ সম্মিলিতভাবে বুখারী ও মুসলিমে, ৮১টি বুখারীতে এবং ৩১টি মুসলিম শরীফে পৃথকভাবে বর্ণিত হয়েছে।[১৭] তাঁর এত অধিক হাদীছ বর্ণনার অন্যতম কারণ ছিল তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শ্রুত হাদীছ মুখস্ত করার পাশাপাশি তা লিখে রাখতেন।[১৮] এ সম্পর্কে আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের মধ্যে আমার চেয়ে বেশী হাদীছ বর্ণনা কারী আব্দুল্লাহ ইবন ওমর ছাড়া আর কেউ ছিল না। কারণ তিনি হাদীছ লিখে রাখতেন। আর আমি লিখতাম না'।[১৯]

ইবনে ওমর (রাঃ) হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হযরত সাঈদ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'হাদীছ বর্ণনায় ইবনে ওমরের চেয়ে সতর্কতা অবলম্বনকারী আমার নযরে আর কেউ পড়েনি।[২০]

তাঁর নিকট থেকে অনেক মুহাদ্দিছ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বিলাল ও হামযার বংশধর, যায়েদ, সালেম, আব্দুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ, ওমর, তাঁর পৌত্র আবুবকর ইবনে ওবায়দুল্লাহ, অন্য পৌত্র মুহাম্মাদ বিন যায়েদ ও আব্দুল্লাহ বিন ওয়াবেদ, ভাতিজা হাফ্ছ ইবনে আছেম বিন ওমর ও আব্দুল্লাহ বিন ওবায়দুল্লাহ বিন ওমর, গোলাম নাফে', আসলাম, যায়েদ, খালেদ, ওরওয়াহ বিন যুবাইর, মূসা বিন ত্বালহা, আবু সালমাহ, আব্দুর রহমান, আমের, সাঈদ, হুমাইদ বিন আব্দুর রহমান বিন আউফ, সাঈদ বিনুল মুসাইয়েব প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২১]

তাফসীর শাস্ত্রে অবদানঃ তাফসীর শাস্ত্রেও তাঁর গভীর পান্ডিত্য ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করতেন। ইমাম মালেক (রঃ)-এর মুয়াত্তায় বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে ওমর (রাঃ) সূরা বাক্বারার উপরই দীর্ঘ ১৪ বছর গবেষণা করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মজলিসে উপস্থিত থেকে কুরআন মাজীদের তাফসীর সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি।[২২]

ফিকাহ শাস্ত্রে অবদানঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ফিকাহ্ শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। জীবনের বেশীর ভাগ সময় ফৎওয়া দানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন তিনি। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) দ্বীনের অন্যতম ইমাম ছিলেন।[২৩] তিনি আরো বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) ৮৬ বছর বেঁচে ছিলেন, তন্মধ্যে ৬০ বছর ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে ফৎওয়া প্রদান করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার মানুষ দলে দলে তাঁর নিকট আসত। রাসূলের (ছাঃ) ইন্তেকালের পর তিনি ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন। তাই তাঁর নিকট রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের কোন বিষয় গোপন ছিল না'।[২৪] এতদসত্ত্বেও

---

১৩. ইবনে আব্দিল বার্র, আল-ইস্তি'আব ফী মা'রেফাতিল আছহাব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮১।
১৪. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
১৫. ইবন হাযম, আসমাউছ ছাহাবাতির রুইয়াত আলা কুল্লি ওয়াহিদিম মিনাল 'আদাদ (কলিকাতাঃ তা.বি.), পৃঃ ৪; জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, তাদরীবুর রাবী ফী শারহি তাকরীবিন নববী, (মিশরঃ আল-খাইরিয়া, ১৩০৭ হিঃ) পৃঃ ২০৫।
১৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) পৃঃ ২৫৯; কেউ কেউ বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ১৯৮০টি।
দ্রঃ তুফাতুল আশরাফ লি মা'রিফাতিল আত্বরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭; আবার কেউ বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ১০৩৬টি।
দ্রঃ বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪।
১৭. হাফেয মিযযী, তাহযীবুল কামাল, পৃঃ ২০৭; হাদীছ সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ২৫৯।
১৮. ইমাম দারেমী, মুসনাদ (মদীনা ছাপা), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৬।
১৯. মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল, ছহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ২২।
২০. আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৯।
২১. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১-৯২; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
২২. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৪-৭৫।
২৩. তুহফাতুল আশরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮।
২৪. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিলদ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬; তুহফাতুল আশরাফ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৪।

http://islaminonesite.wordpress.com

ফৎওয়া প্রদানের সময় তিনি যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতেন।[২৫] কোন বিষয়ে সামান্য সন্দেহ থাকলে এ বিষয়ে তিনি কোন ক্রমেই ফৎওয়া দিতেন না।[২৬]

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ হযরত আনাস ও সাঈদ বিন মুসাইয়েব (রাঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৭] ইবনু মান্দাহ বলেন, তিনি বদর ও ওহোদ যুদ্ধে অনুমতি ব্যতীত শরীক হয়েছিলেন।[২৮] হযরত বারা বলেন, আমি এবং ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বদরের দিন রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে পেশ করা হ'লে তিনি আমাদের ছোট বললেন। এরপর ওহোদ যুদ্ধে আমরা শরীক হই। ইমাম হাকেম বর্ণনা করেন, ইবনে ওমর (রাঃ) খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আর এটিই ছিল তাঁর প্রথম যুদ্ধে অংশগ্রহণ।[২৯] তিনি হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন বায়'আতে রিযওয়ান বা বায়'আতে শাজারাহ্তে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩০] এছাড়া তিনি ইয়ারমুক, ক্বাদিসিয়াহ, জালাওলা, মিশর বিজয়, পারস্য অভিযান প্রভৃতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[৩১] খায়বার, হুনাইন, তায়েফ, তাবুক, মক্কা বিজয় (৮ম হিঃ), আফ্রিকা (তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো) অভিযান (২৭ হিঃ), ৩০ হিজরীতে খোরাসান ও তাবারিস্তান যুদ্ধ এবং কনষ্টান্টিনোপলের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। উষ্ট্র ও সিফ্ফিনের যুদ্ধে তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন।[৩২]

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনঃ হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) কর্তৃক মনোনীত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে ইবনে ওমর (রাঃ) রাজনৈতিক অঙ্গণে আবির্ভূত হন।[৩৩] হযরত ওছমান (রাঃ) স্বীয় শাসনামলে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বিচারপতির পদ দেয়ার প্রস্তাব পেশ করলে তিনি তা গ্রহণ করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলা হয়ে থাকে যে, ধর্মীয় নির্দেশের বিশ্লেষণে ভুল হওয়ার আশংকায় তিনি কাযীর পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন।[৩৪]

পরবর্তীকালে তিনবার তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়ঃ

(১) হযরত ওছমান (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর (৩৫ হিঃ/৬৫৫ খৃঃ) (২) হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে সিফ্ফীনের যুদ্ধ সংঘটি হওয়ার সময় বিরোধ মীমাংসার জন্য দু'জন ফায়ছালাকারী নিযুক্ত করার সময় (৩৭-৩৮ হিঃ/৬৫৭-৫৮ খৃঃ) (৩) প্রথম ইয়াযিদের মৃত্যুর পর (৬৪ হিঃ/৬৮৩ খৃঃ)। কিন্তু প্রতিবারই তিনি উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মূলতঃ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রশাসনিক কোন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত হননি। বরং তা হ'তে দূরে থাকাই তিনি পসন্দ করতেন। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক কাজে অতিবাহিত করেছেন।[৩৫]

আল্লাহ্ভীতিঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন। আল্লাহভীতি এবং শেষ বিচারের দিনের ভয়ে তিনি সদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকতেন।[৩৬] আখেরাতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কিত কোন আয়াত শুনলেই তিনি ভীত হয়ে পড়তেন এবং ক্রন্দন করতেন।[৩৭] একদা ওবায়দুল্লাহ বিন ওমরকে নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে শুনলেন–

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَّ جِئْنَا بِكَ عَلَى هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا

'হে রাসূল! আখেরাতের সেদিন কি অবস্থা হবে, যখন আমরা প্রত্যেক উম্মতের পক্ষ থেকে একজন সাক্ষী এনে দাঁড় করাব এবং আপনাকে তাদের ওপর সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাব' (নিসা ৪১)। এ আয়াত শুনে ইবনে ওমর (রাঃ) কাঁদতে শুরু করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ও বুকের কাপড় ভিজে গেল।[৩৮] আল্লাভীতি তাঁর অন্তরে জিহাদ ও ইবাদতের তীব্র অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিল। জিহাদ

---

২৫. হাফেয জামালুদ্দীন বলেন, وكان شديد التحرى والاحتياط والتوقى فى فتوا،
দ্রঃ তুহফাতুল আশরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭-৮।

২৬. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।

২৭. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪১; তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

২৮. তাহযীবুত তাহযীব ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৩।

২৯. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছাহীহাইন ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৪; ইমাম যাহাবী বলেন,
واستصغر يوم احد فاول غزواته الخندق
দ্রঃ নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা, (জেদ্দাহঃ দারুল আন্দালুস, ১ম প্রকাশ, ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ইং) ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩।

৩০. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯১; নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৩; আল মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৫।

৩১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫; তুহফাতুল আশরাফ লি মা'রিফাতিল আত্বরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৭।

৩২. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯-৭১।

৩৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০; In political affairs, he appears for the first time as adviser to the council appointed by the dying umar to choose from among its own members the future caliph. See. The Encyclopaedia of Islam, V-1, P-54.

৩৪. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০; It is related that he would not accept the office `kadi' fearing that he might not be able to interpret the divine law correctly. See. The Encyclopaedia of Islam, V-1, P-54.

৩৫. The Encyclopaedia of Islam, V-1, P-54. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬০।

৩৬. قال طاوس وميمون بن مهران : "ما رأيت اورع من ابن عمر"
দ্রঃ তুহফাতুল আশরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৮।

৩৭. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৩৮. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

ও ইবাদত ব্যতীত তিনি থাকতে পারতেন না।[৩৯]

অনাড়ম্বর জীবন-যাপনঃ তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন-যাপন করতেন। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র ইবনে ওমরই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যাকে পার্থিব কোন কিছুই আকৃষ্ট করতে পারেনি।[৪০] হযরত সুদ্দী বলেন, রাসূলের (ছাঃ) ইন্তেকালের পর কোন পরিবর্তন ছাড়া একমাত্র ইবনে ওমর (রাঃ)-কেই দেখা যায়।[৪১] তিনি প্রায় সব কাজই নিজ হাতে করতেন। একেবারে সাধারণ পোষাক পরিধান করতেন তিনি। কামীছ, ইযার ও কাল পাগড়ী ছিল তাঁর অন্যতম পোষাক।

সুন্নাতের অনুসরণঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মহানবী (ছাঃ)-এর একনিষ্ট অনুসারী ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) যেভাবে মহানবী (ছাঃ)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন অনুরূপ আর কেউ করতেন না।[৪২] হযরত নাফে' বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) মহানবীর (ছাঃ) অনুসরণ এমনভাবে করতেন যে, কেউ দেখলে তাঁকে পাগল বলবে।[৪৩] তিনি আরো বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূলের (ছাঃ) পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। এমনকি রাসূল (ছাঃ) কোন বৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম নিলে তিনিও সেখানে বিশ্রাম নিতেন এবং সেই বৃক্ষে পানি সিঞ্চন করতেন যাতে তা শুকিয়ে না যায়।[৪৪] এজন্য সাঈদ ইবনুল মুছাইয়েব (রাঃ) বলতেন, আমি যদি জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দিতাম তাহ'লে ইবনে ওমরের জন্য সাক্ষ্য দিতাম।[৪৫]

ইবাদতঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একজন প্রকৃত আবেদ ছিলেন। অধিকাংশ রাত ছালাত আদায় করে অতিবাহিত করতেন। এর কারণ সম্পর্কে তিনি বর্ণনা করেন, যৌবনের প্রারম্ভে আমি মসজিদে শুয়ে থাকতাম। একদা স্বপ্নে জাহান্নাম দেখে তা থেকে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাইলাম। অতঃপর এ স্বপ্নের কথা হাফসাকে (রাঃ) বললাম। হাফসা রাসূল (ছাঃ)-কে বললে তিনি বলেন, 'আব্দুল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোক। যদি সে রাতে ছালাত আদায় করত।[৪৬] এরপর থেকে তিনি রাতে যৎসামান্য ঘুমাতেন। কোনদিন এশার জামা'আত ছুটে গেলে অবশিষ্ট রাত ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। প্রত্যেক বার ছালাত আদায় ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য নতুন করে ওযূ করতেন![৪৭] তিনি এত বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করতেন যে, কোন কোন সময় একরাতে সম্পূর্ণ কুরআন শেষ করতেন। অনুরূপ ভাবে লাগাতার ছিয়ামও পালন করতেন তিনি। জীবনে ৬০ বার হজ্জ ও ১০০০ বার ওমরাহ পালন করেছিলেন।[৪৮]

তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কোন কোন দিন এক বৈঠকে ৩০ হাযার (দেরহাম বা দিনার) পরিমাণ দান করতেন। তাঁর ধন-সম্পদের মধ্যে কোন জিনিস তাঁর বেশী পসন্দ হ'লে তা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিতেন।[৪৯] এ সম্পর্কে তিনি বলেন, একদা আমি لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون আয়াতটি পাঠ করলাম। অতঃপর স্মরণ করতে লাগলাম আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদের মধ্যে আমার রুমাইছা নাম্নী দাসী আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমি তখন তাঁকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে আযাদ করে দিলাম।[৫০] এভাবে জীবনে তিনি ১০০০ গোলাম আযাদ (মুক্ত) করেছিলেন।[৫১]

সত্যের পথে নির্ভিক সৈনিকঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর এবং হকের পথে নির্ভিক সাহসী যোদ্ধা। খালেদ বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, একদা হাজ্জাজ বিন ইউসুফ খুৎবা প্রদান কালে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে এ বলে অপবাদ দিলেন যে, ইবনে যোবায়ের কুরআনের অক্ষর পরিবর্তন করেছেন। একথা শুনে ইবনে ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। কুরআনের অক্ষর পরিবর্তনের শক্তি তোমার ও তাঁর নেই। এতে হাজ্জাজ রাগান্বিত হয়ে বললেন, চুপ করো, তুমি পাগল হয়েছ। অতঃপর হাজ্জাজ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এক সিরিয়াবাসীকে নিয়োগ করেন। সে হজ্জের সময় বিষ মিশ্রিত বর্ষা ইবনে ওমরের (রাঃ) পায়ে বিদ্ধ করলে বিষ ক্রিয়ায় তিনি ইন্তেকাল করেন।[৫২]

অন্য বর্ণনায় আছে, একবার হাজ্জাজ বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল। ছালাতের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার উপক্রম হলেও তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন না।

---

৩৯. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৪০. তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৯২; عن عائشة قالت ما رأيت احزم للأمر الاول من عبد الله بن عمر"

দ্রঃ আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৪।

৪১. তুহফাতুল আশরাফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৮; عن حذيفة (رض) قال: لقد تركنا رسول الله (ص) يوم توفى وما منا أحد الا و تغير عما كان عليه الا عمر و عبد الله بن عمر (رض)"

দ্রঃ আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪১।

৪২. ইবনে সা'দ, ত্বাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৪-১৪৫।

৪৩. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।

৪৪. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীবু সিয়ারু আ'লাম আন্-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬।

৪৫. হাফেয যাহাবী, তাযকিরাতুল হুফ্ফায (হায়দারাবাদঃ তা.বি.) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৫।

৪৬. ইমাম বোখারী, আল-লু-লু ওয়াল মারজান, (রিয়াযঃ মাকতাবাহ দারুল ফাইহাঃ ১ম প্রকাশ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২০; ইমাম মুসলিম, ছহীহ মুসলিম, (দেওবন্দঃ মুখতার এণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৬ ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৯।

৪৭. নুযহাতুল ফুযালা তাহযীব সিয়ারু আ'লাম আন-নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।

৪৮. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৭।

৪৯. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৫ম জিল্দ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৫-৬।

৫০. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৭।

৫১. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৭।

৫২. নুযহাতুল ফুযালা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬০।

http://islaminonesite.wordpress.com

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তখন তিনবার বললেন, 'ছালাতের সময় হয়েছে বসে যাও'। তবুও বক্তৃতা বন্ধ না করাতে তিনি লোকজন নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং হাজ্জাজকে বললেন, তোমার ছালাতের প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে হাজ্জাজ মিম্বর থেকে নেমে ছালাত শেষ করে ইবনে ওমরকে (রাঃ) বললেন, এমন করলেন কেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমরা সময় হ'লে যথাসময়ে ছালাত আদায়ের জন্য এসে থাকি। এরপর যা ইচ্ছা বলতে পার। ইবনে ওমরের এ স্পষ্টবাদিতার জন্য হাজ্জাজ শত্রুতে পরিণত হল এবং বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে হজ্জের ভীড়ে আঘাত করে তাঁকে আহত করল।[৫৩]

ইমাম হাকেম বর্ণনা করেন, ইবনে যোবায়েরের বিরুদ্ধে হাজ্জাজ মক্কায় এসে কা'বার দিকে মুখ করে কামান ফিট করে গোলা বর্ষণের প্রস্তুতি নিলে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়েন এবং হাজ্জাজকে গালমন্দ করেন। এতে হাজ্জাজ রাগান্বিত হয় এবং তাঁর ইঙ্গিতে এক সিরিয়াবাসী বিষ মিশ্রিত বর্শা দিয়ে তাঁকে আহত করে। তিনি অসুস্থ হ'লে হাজ্জাজ তাঁকে দেখতে এসে বলল, অপরাধীর পরিচয় জানলে সে তার গর্দান উড়িয়ে দিত। তখন ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, এসব তোমারই কীর্তি। হারাম শরীফে অস্ত্র আনার অনুমতি না দিলে এ ঘটনা ঘটত না।[৫৪]

ইবনে ওমরের (রাঃ) কিছু উপদেশঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) অত্যন্ত সঠিক রায় সম্পন্ন ও বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন। তাঁর অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল। যা পাঠ করে তদানুযায়ী আমল করলে মুসলিম মানবতা উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

উপদেশ সমূহ-

(১) সর্বাপেক্ষা সহজ নেকী হ'ল প্রফুল্ল মুখ এবং মিষ্টি কথা।

(২) শত্রুর কাছ থেকে হ'লেও জ্ঞানার্জন কর।

(৩) অন্যের দোষ খোঁজার আগে নিজের দোষের প্রতি নযর দাও।

(৪) সুমিষ্ট শরবৎ যেভাবে পান করে থাক, তেমনি ক্রোধ হজম কর।

(৫) আল্লাহ্র নিকট কোন বান্দাহ যতই প্রিয় হোক না কেন, সে যখন কোন পার্থিব কিছু চায়, তখন আল্লাহ্র নিকট তাঁর মর্যাদা নিঃসন্দেহে কমে যায়।

(৬) মানুষ তখন জ্ঞানীদের দলভূক্ত হ'তে পারে, যখন সে নিজের চেয়ে উচুঁ লোক শত্রু মনে করবে না এবং নিজের চেয়ে কম জ্ঞান সম্পন্ন লোককে অবজ্ঞা করবে না। আর নিজের জ্ঞানের মূল্য নেবে না।

(৭) চরিত্র খারাপ হ'লে ঈমানও খারাপ হবে।

(৮) পাপ করতে চাইলে সে স্থান তালাশ কর, যেখানে আল্লাহ নেই।

(৯) ইবাদতের স্বাদ হাছিল করতে চাইলে একাকীত্ব তালাশ কর। বন্ধু এবং ওয়াকিফহাল লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। তবে এটা রুযী তালাশের পর এবং পরিবার-পরিজনকে মিষ্টি ঘুমের ব্যবস্থা করে দেয়ার পর।

(১০) আমি প্রথমতঃ হাদীছের ওপর আমল করি। তারপর তা মানুষকে শুনাই।[৫৫]

ইন্তেকালঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) ৭৩ হিঃ সনে (৬৯৩ খৃঃ) ৮৬ বছর বয়সে মক্কায় ইন্তেকাল করেন।[৫৬] সালেম বলেন, আমার পিতা তাঁকে হারামের বাইরে দাফন করার অছীয়ত করেছিলেন। কিন্তু আমরা তা করতে সক্ষম হইনি। তাঁকে হারামের মধ্যে মুহাজিরদের করবস্থানে সমাহিত করলাম।[৫৭]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা বহুল জীবন উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য হেদায়াতের দিশারী। কেননা রাসূল চরিতের বিভিন্ন দিকের হুবহু চিত্র পরিলক্ষিত হয় তাঁর জীবনে। তাই তাঁকে হাদীছের দর্পণ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বর্তমান বিশ্বে সত্য যখন পদানত, ন্যায় যখন পরাভূত, যুলূম, শোষণ ও অত্যাচারের অসহনীয় চাপে যখন আদল, ইহসান ও সদাচার মুখ থুবড়ে পড়েছে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রবল স্রোতে ইসলামী সংস্কৃতি যখন ভাসমান, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর জীবন চরিত অধ্যয়ন সঠিক পথের সন্ধ্যান দিবে। প্রেরণা যোগাবে হকের পথে দৃপ্ত পদে চলার ও ন্যায়ের পথে অটল অবিচল থাকার। উৎসাহ দিবে ইসলামের খেদমতে মসি চালাবার, শক্তি দিবে বাহুতে দ্বীনের জন্য অসি চালাবার।

আসুন! দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবক, হকের পথে নির্ভিক সৈনিক, হাদীছে নববীর যথার্থ অনুসারী ইবনে ওমরের (রাঃ) জীবনালেখ্য হ'তে ইবরত হাছিল করে নিজেদের ইহকাল ও পরকালীন জীবনে শান্তি ও মুক্তি অর্জনে ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক এনায়েত করুন! -আমীন!!

---

৫৩. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭৩।
৫৪. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৩।
৫৫. বিশ্বনবীর সাহাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৬।
৫৬. তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০ম খণ্ড, ফুটনোট, পৃঃ ২২১; আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪১-৪২; قال الزبير بن بكار و آخرون: توفى سنة ثلاث و سبعين و قال الواقدى و جماعة: توفى ابن عمر سنة اربع و سبعين

দ্রঃ আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৬।
৫৭. আল-মুস্তাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪৩।

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

কবিতা

হাম্‌দ

-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল
সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
দিনাজপুর (পঃ) সাংগঠনিক যেলা।

ওগো প্রভু, ওগো দয়াময়,
তোমার তুলনা কি হয়?
তুমিতো রহমান ও রহীম;
ক্ষমতা তোমার অনন্ত অসীম।
তোমারই কৃপায়-
শান্তি যে আছে হেথায়।
সবুজ শ্যামল মাটির পরে,
বিছায়েছ বিছানা সবার তরে।
সুদূর নীল আকাশ,
আরামদায়ক শীতল বাতাস,
রহমতের অবিরত ধারা,
দিয়েছো তুমি জগৎ ভরা।

***

লক্ষ্য মোদের

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

আমরা তরুণ সদ্য অরুণ চাই জিহাদী যিন্দেগী
নিষ্ঠা ভরে করব মোরা আল্লাহ তা'আলার বন্দেগী।
অবিচার আর অসত্যেরে নগ্ন পায়ে দলব
সত্য নিশান থাকবে হাতে বুক উঁচিয়ে চলব।
বিশ্বটারে জয় করতে ছুটব মোরা দিগ্বিদিক
আসবে পথে শতেক বাধা, ভয় করিনা সু-নির্ভীক।
ভয় কি মোদের অগ্রনায়ক বিশ্বনবী মুস্তফা
নত শিরে মানবো মোরা তাঁরই দেয়া সব দফা।
মুহাম্মাদের জীবন পথে চালিয়ে যাব এই জীবন
তাওহীদেরই ঝাণ্ডা হাতে থাকবে মনে কঠোর পণ।
অহি-র বিধান ছড়িয়ে দিতে যায় চলে যাক সতেজ প্রাণ
ছিয়াহ্ ছিত্তা দিক দিশারী লক্ষ্য মোদের আল-কুরআন।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যায় যাদের উত্তর সঠিক হয়েছেঃ

❐ **শামসুন্নাহার ইসলামিয়া মাদরাসা, হাতেম খাঁ, রাজশাহী থেকেঃ** জান্নাতুল মাওয়া, সালমা শাহনাজ, রাখিয়া সুলতানা, নীতু পারভীন, ছিফাতুন্নাহার, নূরজাহান, সাবিনা, শারমিন আখতার, এফতারুন্নেসা, রেবেকা সুলতানা, নীতু সুলতানা, শারমিন সাথী, তৌকির আহমাদ, তারিক আল-আযীয, ফায়সাল, হাসান আলী, রায়হান আলী, সাব্বির, মাস'ঊদুর রহমান, আব্দুল ওয়াহেদ, রাসেল ও মোফাযযল হোসায়েন।

❐ **মোল্লাপাড়া, রাজশাহী কোর্ট থেকে ঃ** আশিকুর রহমান, মেহদী হাসান, তাসলীমুল আরিফ, ফাযলে রাব্বী, জান্নাতুন নাঈম, আব্দুল্লাহ মঈদ (ছাক্বিব) ও আব্দুল মুক্বীদ।

❐ **শেখপাড়া, রাজশাহী থেকে ঃ** নাজনীন আরা, হালীমা, মাহ্‌ফূযা, রেহানা, সৌহিদাতুন নেসা, রীনা, রাহেলা, জেসমিন আক্তার, শারমীন ফেরদৌস, রেযিয়া, মানছূরা, যাকারিয়া, যয়নাল ও কমেলা।

❐ **নগরপাড়া, রাজশাহী থেকে ঃ** মুসলিমা, ইতি খাতুন, মমতাজ, ফরিদা, মেহেরুন নেসা, ময়না, সাকিলা, সুকতারা, ফরিদা, শিলা, ময়না, রাজন ও ইসমুতারা।

❐ **হড়গ্রাম আমবাগান, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী থেকে ঃ** তানযিলা, অহিউল্লাহ, পিয়াল, রণি ও গোলাম কিবরিয়া, ফাতেমা, মেহের যাবীন, লাবনী, জুলেখা, শহিনুর ও শাহিদা।

❐ **মিয়াঁপুর, রাজশাহী থেকে ঃ** যিল্লুর রহমান, মিনারুল, ফরীদ, হাবীব ও আবুদাঊদ, শামীমা, শাহিনা, রুমা, মিনা, জিন্না, রহীমা, রোকসানা, হাবীবা, মাসকুরা, আয়েশা, কাজলী, আসমা, পপি, হাসিনা ও আনোয়ারা।

❐ **হরিষার ডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, রাজশাহী থেকে ঃ** আরফান, জাহাঙ্গীর, মুকুল, রিয়াযুল, রবীউল, মাঈনুল, সিরাজুল, রফিকুল, আব্দুল বারী, মে'রাজ, রিপন, যাকারিয়া ও বুলবুল আহমাদ, শরীফা, বিলকিস, মর্জিনা, সখিনা, সুমাইয়া, রাবেয়া, মুর্শিদা, আয়েশা, মাকসুরা, সাজেদা, আজমীরা, মা'ছূরা, মেরীনা, পারভীন, নূরজাহান,

http://islaminonesite.wordpress.com

শরীফা, শারমীন সুলতানা ও আয়েশা।

❐ **সমসপুর হাফেযিয়া মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** মোযাফ্ফর হোসায়েন, বেলাল হোসায়েন, বাবুল হোসায়েন, আব্দুল ওয়াহেদ, মনীরুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর আলম।

❐ **মঙ্গলপুর, বাগমারা, রাজশাহী থেকেঃ** যয়নুল আবেদীন, রইসুদ্দীন, শহীদুল ইসলাম, আফযাল হোসায়েন ও বাবুল হোসায়েন, মমতাজ খাতুন, খাদীজা, আফরোযা, রাশীদা, মিনারা আখতার বানু, পারুন নেসা, রযূফা ও ডালমী।

❐ **বাউসা হেদাতীপাড়া দাখিল মাদরাসা, বাঘা, রাজশাহী থেকেঃ** শহীদুল ইসলাম, আনারুল ইসলাম, জাহিদুল ইসলাম, মনযূরুল ইসলাম, শামিরুল ইসলাম, যহুরুল ইসলাম, আমজাদ আলী শেখ, মনীরুল ইসলাম, আক্কাচ আলী, তমীরুল ইসলাম, মুখলেছুর রহমান, উজ্জল ইসলাম, আব্দুল আওয়াল, মতীউর রহমান, সাইফুল ইসলাম ও আমানুল্লাহ, শামসুন নাহার, ছুফিয়া, নেহেরা খাতুন, আরিফা খাতুন, মর্জিনা খাতুন, বিউটি, মুত্ত্বাহেরা খাতুন, রোকসানা পারভীন, তাসলীমা, ওয়াহিদা খাতুন, সাবেকুন নাহার, ফাতেমা, আফরোযা, লাভলী, মুর্শিদা ও মনীরা খাতুন।

❐ **সৈয়দা ময়েজ উদ্দীন বালিকা বিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী থেকে ঃ** রাশেদা খাতুন, সুইটি আরা, রোযিনা, ফিরোযা, ফরিদা, শিরাজুম মুনীরা, ঝর্ণা খাতুন, শামসুন নাহার, আঙ্গুরী, বিউটি, জোৎস্না, তারা বানু, আঞ্জুয়ারা, সেলিনা আখতার, আফরোযা ও আঞ্জুমান আরা।

❐ **কুশলপুর দাখিল মাদরাসা, বাগমারা, রাজশাহী থেকে ঃ** আব্দুর রশীদ, জাহিদুল আলম, জাহাঙ্গীর আলম, মুযাহারুল ইসলাম,. শাহজাহান আলী, সুলতান, আব্দুল হান্নান, এনামুল, নজরুল, নাজীম, আব্দুর রায্যাক, গিয়াসুদ্দীন, শহীদুল, আলতাফ, আমজাদ ও যাকারিয়া, রাশেদা, সাহানারা, বিলকিস, বারিছা, আঞ্জফা, পারুল, শিরিন, মর্জিনা, ছাকিনা আক্তার, রাযিয়া, শাহনাজ ও লিপি।

❐ **ইটাপোতা, লালমণিরহাট থেকেঃ** মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

❐ **চোরকোল, ঝিনাইদহ থেকেঃ** মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, মুসাম্মাৎ নাসরীন সুলতানা।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের সঠিক উত্তরঃ

১. হযরত ওছমান (রাঃ)। রোক্বাইয়া ও উম্মে কুলছুমকে পরপর বিবাহ করার কারণে। (তাঁরা দু'জনই নবী করীম (ছাঃ)-এর কন্যা ছিলেন)।

২. ৬ জনকে। তাঁরা হলেন- ওছমান, আলী, ত্বালহা, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ ও সা'দ (রাঃ)।

৩. হযরত ওছমান (রাঃ)-এর উপনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ। তিনি ১৪৬টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

৪. পাহাড়টির নাম 'ওহোদ'। ছাহাবী তিন জনের নাম হ'ল আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)।

৫. হযরত ওছমান (রাঃ) ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের ১৮ তারিখ শাহাদত বরণ করেন।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষার সঠিক উত্তরঃ

১.

২. IX

৩. কলা তিনটি। অস্ত্র- ষ্টীলের গ্লাস।

৪. সমান। লোহা।

৫. ধোঁয়া-ই নেই।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান

১. 'মাটির বাপ' কোন ছাহাবীর উপাধি ছিল? এই উপাধি তাঁকে কে দিয়েছিলেন?

২. হযরত আলী (রাঃ)-এর পিতা ও মাতার নাম কি? তিনি কতগুলি হাদীছ বর্ণনা করেছেন?

৩. নবী (ছাঃ)-এর নবুঅত লাভের দিন কি বার ছিল? তার কতদিন পর আলী (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন?

৪. মুনাফেকের আলামত বা চিহ্ন কয়টি?

৫. হযরত আলী (রাঃ)-কে হত্যাকারীর নাম কি? তাঁর ছালাতে জানাযা কে পড়িয়েছিলেন?

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (রহস্য)

১. নিজের পেটের নিচে থলে আছে এবং সেই থলেতে বাচ্চা রেখে ঘুমায় কোন প্রাণী?

২. পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম বুকে হাঁটা প্রাণীর নাম কি?

৩. কোন প্রাণীর রক্ত সাদা?

http://islaminonesite.wordpress.com

৪. পৃথিবীতে কোন মাছ দুধ দেয় এবং ডিমের পরিবর্তে বাচ্চা দেয়?

৫. কোন প্রাণী তার দেহকে ইচ্ছেমত বাড়াতে ও কমাতে পারে?

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(৭০) আলাইপুর গাবতলী পাড়া ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালক) শাখা, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ তাজ উদ্দীন (শিক্ষক)

উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন (")

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের, আরীফ হোসায়েন, কামরুয্যামান ও ফারূক হোসায়েন।

(৭১) আলাইপুর গাবতলী পাড়া ফুরক্বানিয়া মাদরাসা (বালিকা) শাখা, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ তাজ উদ্দীন (শিক্ষক)

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ জালাল উদ্দীন (")

পরিচালকাঃ মুসাম্মাৎ আদুরী খাতুন।

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ ফাতেমা খাতুন, সাবিনা খাতুন, নাগরী খাতুন ও রেবেকা খাতুন।

(৭২) মণিগ্রাম গঙ্গারামপুর জামে মসজিদ (বালক) শাখা, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবুল হোসায়েন ছিদ্দীকি (শিক্ষক)

উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ এবাদুল্লাহ্

পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মুস্তাক আহমাদ

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান, মাস'উদ, আসাদুয্যামান ও বাবর আলী।

(৭৩) মণিগ্রাম গঙ্গারামপুর জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, বাঘা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন ছিদ্দীকি (শিক্ষক)

উপদেষ্টাঃ মুসাম্মাৎ নিলুফার ইয়াসমিন,

পরিচালকাঃ মুসাম্মাৎ হালীমা খাতুন,

৪ জন কর্মপরিষদ সদস্যাঃ মুসাম্মাৎ আম্বিয়া খাতুন, নারগিস, মমতাজ বেগম ও বিলকিস খাতুন।

আত-তাহরীক

-মুনীরা রহমান
ত্রিশাল, মোমেনশাহী।

আত-তাহরীক তুমি এগিয়ে চল
দিকে দিকে আলো জ্বাল
কুরআন-হাদীছের কথা বলে
ন্যায়ের পথে এগিয়ে চল।
আত-তাহরীক তুমি স্বাধীন চেতা
কুরআন হাদীছের খুলে পাতা
দেখিয়ে দিয়েছ আলোর রেখা।
আত-তাহরীক তোমায় ধন্যবাদ
দিকে দিকে তোমার জয় ধ্বনি গেয়ে যাক।

***

প্রজাপতি

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ (৪র্থ শ্রেণী)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

প্রজাপতি প্রজাপতি
কোথায় তুমি যাও?
তোমার সাথে সঙ্গে করে
আমায় নিয়ে যাও।
আমার বড় সাধ জাগে
তোমার মত উড়তে,
তোমার মত ঘুরে ঘুরে
ফুলের মধু খেতে।
কি সুন্দর পাখা তোমার
অনেক রঙে ভরা,
তোমায় পেলে ফুলকলি সব
খুশিতে আত্মহারা।
অগণিত সৃষ্টি আল্লাহ্র
কত সুন্দর এ ভবে,
আলহামদুলিল্লাহ বলে
শুকরিয়া করি, এসো আমরা সবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা

ঢাকায় পঞ্চম আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা সম্প্রতি শেষ হয়েছে। পুরো ফেব্রুয়ারী মাস ব্যাপী এ মেলা চলেছিল। দেশীয় পণ্যের পরিচিতি ও বিক্রি বাড়ানোর প্রধান উদ্দেশ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে এ মেলা অনুষ্ঠিত হলো। মেলায় ৩৬টি প্যাভেলিয়নের মধ্যে ২৫টি দেশী ও ১৩ টি বিদেশী; ৫৭ টি মিনি প্যাভেলিয়নের মধ্যে ৪৪ টি দেশী ও ১৩ টি বিদেশী, ২৮৫ টি স্টলের মধ্যে ২২৩ টি দেশী ও ৫২ টি বিদেশী প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ পেয়েছিল। আমেরিকা, চীন, জাপান, বৃটেন, জার্মানী, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, আফগানিস্তান, আরব আমীরাত ও ভারত সহ প্রায় ৩০টি দেশ তাদের দেশীয় পণ্য নিয়ে মেলায় স্টল বসায়। এবারের বাণিজ্য মেলা ব্যাপক ভাবে গ্রাহক ও ভোক্তাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হলো- স্থানের অভাবে ৪৭২ টি দেশী প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশ নেয়ার সুযোগ পায়নি। যার ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশীদের কাছে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়। এবারের মেলায় দেশ-বিদেশের প্রযুক্তি ও শিল্পের বিপুল সমাহার ঘটে।

কাজী আরেফ সহ ৫ জন ব্রাশ ফায়ারে নিহত, ২০ জন আহত ও গ্রেফতার ১ জন

বাংলাদেশে স্মরণ কালের লোমহর্ষক ও হৃদয় বিদারক সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটে গেছে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী। জাসদের অন্যতম শীর্ষ নেতা মুক্তিযুদ্ধের বিশিষ্ট সংগঠক কাজী আরেফ আহমাদ সহ ৫ জন ব্যক্তিকে শত শত লোকের সম্মুখে জনসভার মঞ্চে প্রকাশ্যে সশস্ত্র চরমপন্থীদের ব্রাশ ফায়ারে নির্মমভাবে প্রাণ দিতে হয়। গুলীতে আহত হয় আরও ২০ জন। ঘটনার দিন বিকেলে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানার বড়কান্দি গ্রামে সন্ত্রাস বিরোধী একটি জনসভা মঞ্চে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন কাজী আরেফ। অল্প পরেই অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রেসজ্জিত হ'য়ে ৮ জন মুখোশধারী সশস্ত্র চরমপন্থী মঞ্চে বসা নেতৃবৃন্দকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার শুরু করে। এ সময় কাজী আরেফ সহ স্থানীয় গণ্যমান্য আরও ৪ জন নেতা নিহত হন। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্তম্ভিত করেছে সবাইকে। নিন্দা জানিয়েছে বিভিন্ন পর্যায়ের সংগঠন ও মানুষ। ইতোমধ্যে এ হত্যার সাথে জড়িত সন্দেহে পুলিশ ঢাকা থেকে আসামী ছিদ্দীক মোল্লাকে গ্রেফতার করেছে। ছিদ্দীক মোল্লা চরমপন্থী দলের অন্যতম নেতা। সে অন্তত ১০/২৫ জনকে হত্যা করেছে বলে খবরে জানা গেছে। বিভিন্ন হত্যা ও অপরাধ মামলায় ছিদ্দীক মোল্লা ৮৬ বছরের সাজা প্রাপ্ত। এ আসামী আরেফ হত্যার পর ঢাকায় আত্মগোপন করে।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর অপসংস্কৃতির দাওয়াত

'সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন একদিন দণ্ডিত হয়েছিলেন ভালবেসে, কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের মত ব্যক্তি আজ ভালবেসে দণ্ডিত নন। ইমপিচমেন্টের দায় থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন। তার প্রেমের জয় হোক। 'ক্লিনটন-মনিকা প্রেম অমর হোক'। ভ্যালেন্টাইন ডে বা বিশ্ব ভালবাসা দিবস উপলক্ষে গত ১৪ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি.এস.সিতে কতিপয় তরুণ আয়োজিত এক অনষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, ভালবাসার এই দিনে তুমি যেন বহতা নদী আমি শ্যামল দু'কুল হয়ে তোমাকে বেঁধে রাখি। মন্ত্রী অন্তরে অন্তর স্থাপন করে হৃদয়ে হৃদয় দিয়ে পলিটি প্রেমিক যুগলের অমর ভালবাসার সার্থকতা কামনা করেন।

[খুন, ধর্ষণ ও সন্ত্রাসে পরিপূর্ণ এদেশে ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষে মাধ্যমে তরুণ-তরুণীদের অবৈধ প্রেমকে রাষ্ট্রীয় ভাবেই যেন স্বীকৃতি দেয়া হ'ল। উস্কে দেয়া হ'ল আদিম উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠতে। এমনকি ক্লিনটন-মনিকার অবৈধ সম্পর্ককে স্বাগত জানানোর মাধ্যমে ক্রমাবনতিশীল এদেশের তরুণ-তরুণীদের প্রকারান্তরে রাষ্ট্রীয়ভাবে অবৈধ সম্পর্কের দিকেই স্বাগত জানানো হ'ল। প্রতিমন্ত্রীর এহেন জঘন্য বক্তব্য দেশের যুব সমাজকে নৈতিক চরিত্র ধ্বংসের পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠতে প্রেরণা দিয়েছে। যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিশ্চিত ভাবে এক অশুভ সংকেত।

উল্লেখ্য, ভ্যালেন্টাইন ডে 'বিশ্ব ভালবাসা দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে। যা বাংলাদেশেও পালিত হ'ল। কিন্তু সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন একজন ধর্মযাজক ছিলেন। ইটালীতে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে সেইন্ট ভ্যালেন্টাইন সেদেশের অবিশ্বাসীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তারা তখন বিভিন্ন দেব দেবী এবং জড় বস্তুর উপাসনা করাতো। ঐ সব অবিশ্বাসীদের সহিংস বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি। তার সংগ্রামী জীবনের এই অংশটি ছিল প্রধান। অথচ বিষয়টিকে সম্পূর্ণ বাজে চিন্তাধারা নিয়ে পালন করা হচ্ছে। যা সত্যিই দুঃখজনক। -সম্পাদক]

বোমায় কেড়ে নিল ২টি শিশু প্রাণ

রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা পলিথিন ব্যাগ ও কাগজ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারের সময় পলিথিন ব্যাগে মোড়ানো বোমা বিস্ফোরণে একই পরিবারের ২ শিশুর অকাল মৃত্যু ঘটেছে। মর্মান্তিক এ ঘটনাটি ঘটেছে গত ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকার খিলগাঁও 'বাগিচা' বস্তিতে।

ঘটনার দিন দুপুরে বাগিচা বস্তিতে বসবাসরত রিক্সা চালক শান্ত মিয়া ও তার স্ত্রী শ্যামলা বিবি মাটির চুলায় রান্না করছিল। এ সময় তাদের শিশু সন্তান কাজল (১০) ও লাহিন (৪) তাদের পাশেই বসে ছিল। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা মোড়ানো পলিথিন ও ছেড়া কাগজ চুলায় দেয়ার সঙ্গে

http://islaminonesite.wordpress.com

Contents

সঙ্গে বিকট শব্দে পলিথিনে মোড়ানো বোমা বিস্ফোরণ হয়। এতে সকলে আহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হ'লে কর্তব্যরত ডাক্তার শিশু লাহিনকে তাৎক্ষনিক ভাবে এবং শিশু কন্যা কাজলকে পরে মৃত্য ঘোষণা করেন।

[সন্ত্রাস নির্ভর দলাদলির রাজনীতির অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আর্মস ক্যাডারদের মাধ্যমে এই সব বোমা ও ককটেল এখন যত্রতত্র বানানো হচ্ছে। এরই নির্মম পরিণতি হিসাবে যখন-তখন বেঘোরে প্রাণ দিচ্ছে এভাবে কত কচি প্রাণ, তার হিসাব কে রাখে? -সম্পাদক]

এ কেমন দুঃসাহস?

ঢাকার মিরপুর লালকুঠিতে ঐতিহ্যবাহী হযরত শাহ্ আলী মডেল হাই স্কুলের শিক্ষক দিলীপ কুমার সরকার মানব জাতির আদি পিতা হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে চরম বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করেন। যা মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতি ও মূল্যবোধের উপর তীব্র আঘাত হানে। হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক দিলীপ কুমার ক্লাসে বলেছেন, 'আল্লাহ একেক জায়গায় একেক রকম কথা বলেছেন। মুসলমানদের আল্লাহ্র কথার কোন ঠিক নেই'। শুধু এটুকু বলেই ক্ষান্ত হননি। তিনি নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের ইসলাম ধর্ম বই কেড়ে নিয়ে তা টয়লেটের প্যানে নিক্ষেপ করেন। এ ঘটনার জন্য তাকে স্কুল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। ইতিপূর্বেও তিনি এরূপ অনেক মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

[কুখ্যাত সালমান রুশদীর ভাবশিষ্য দিলীপ কুমারের এ ধরণের ঘৃণ্য আস্ফালন আমাদের বিস্মিত করেছে। জনরোষে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা জন্ম নেয়ার আগে অবিলম্বে সরকারকে দিলীপ কুমারের শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। নিরব থাকলে আমরা বলতে বাধ্য হবো যে, সরকার পরোক্ষভাবে দিলীপ কুমার কিংবা তার দোসরদের পক্ষ নিয়েছেন। -সম্পাদক।]

ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি ৮৭ কোটি ডলার

ঢাকা চেম্বারের সভাপতি এম এইচ রহমান বলেছেন, ১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ভারতে ১১ কোটি ১ লাখ ২০ হাযার মার্কিন ডলারের পণ্য রফতানী করেছে। পক্ষান্তরে ভারত থেকে আমদানীর পরিমাণ ছিল ১০৩ কোটি ৩ লাখ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৮৬ কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার। এই বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৃদ্ধির উপর তিনি জোর দেন। জনাব রহমান ভারতের ত্রিপুরায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত শিল্প মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তৃতায় উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন।

হুমকির সম্মুখীন চাপাই নবাবগঞ্জ শহর

আন্তর্জাতিক নদী পদ্মার ওপর ভারত কর্তৃক ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ এবং অবৈধভাবে একচেটিয়া নদী শাসন প্রতিষ্ঠার কারণে বর্তমানে পদ্মা তার মূল প্রবাহ থেকে প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। অব্যাহত ভাঙ্গনের কারণে পদ্মার গতিপথ পরিবর্তিত হওয়ায় চাপাই নবাবগঞ্জ যেলার সদর ও শিবগঞ্জ থানার বিস্তীর্ণ এলাকা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এবং বর্তমানে চাপাই নবাবগঞ্জ শহরও মারাত্মকভাবে হুমকির সম্মুখীন। গত ১১ ফেব্রুয়ারী নবাবগঞ্জ যেলা নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ সংগ্রাম কমিটি আয়োজিত চাপাই নবাবগঞ্জ প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ একথা বলেন।

চাপাই নবাবগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সভাপতি জনাব গোলাম মোস্তফা মন্টুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে বক্তাগণ অভিযোগ করেন, ১৯৪৭ সালে যে নদী চাপাই নবাবগঞ্জ যেলার ৩৫ কিঃ মিঃ দূর দিয়ে সীমান্ত বরাবর প্রবাহিত হ'ত, তা বর্তমানে অসংখ্য গ্রাম, ফসলী জমি নদী গর্ভে বিলীন করার পর যেলা সদর থেকে মাত্র ১৫ কিঃ মিঃ দূর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ কর্তৃপক্ষের সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করা হ'লে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বক্তাগণ আশংকা প্রকাশ করে বলেন, যরূরী ভিত্তিতে এ ভাঙ্গন প্রতিরোধ করা না হ'লে আগামী বর্ষা মৌসুমেই চাপাই নবাবগঞ্জ শহর রক্ষা হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। বক্তাগণ অনতিবিলম্বে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্য জোর দাবী জানান।

সুদমুক্ত ঋণ

ভোলা যেলার সদর থানায় বিগত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫০টি পরিবারের মধ্যে গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারী সমাজ সেবা মূলক সংগঠন 'জাতীয় বন্ধুজন পরিষদ বাংলাদেশ' সাড়ে ৫ লাখ টাকার সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করেছে। ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন 'বন্ধুজন পরিষদ বাংলাদেশ' -এর প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক প্রতিমন্ত্রী মোশারফ হোসেন শাহজাহান। ঋণ গ্রহীতা সকলেই স্বাক্ষর দিয়ে টাকা গ্রহণ করে। উল্লেখ্য, গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে একবছর মেয়াদী সুদমুক্ত ঋণ কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

কাজের মজুরি গাঁজা

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, কাজের মজুরি দেওয়া হয় গাঁজা খাওয়া। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি প্রতিনিয়ত ঘটছে সাতক্ষীরা যেলার কলারোয়া থানার কয়লা গ্রামে দিলীপ ঘোষের বাড়ীতে। দিলীপ ঘোষের বাড়ীতে একই গ্রামের মালেক, মাওলা ও নূর ইসলাম কামলা খাটে। কিন্তু এই কামলা খাটার জন্য তারা কোন টাকা নেয় না। প্রতি সন্ধ্যায় দিলীপ ঘোষের বাড়ীতে যে গাঁজার আসর বসে সেখানে গাঁজা খেয়ে মজুরি উশুল করে নেয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

বিদেশ

খাদ্য সংকটে রাশিয়া

রাশিয়ার সমস্যা পীড়িত জনগণ তীব্রভাবে খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। দীর্ঘদিন থেকে তারা অর্থনৈতিক মন্দায় হাবুডুবু খাবার পর নতুন করে খাদ্য সংকটে পড়লেন। সে দেশের সরকারী দৈনিক 'ইজভে স্তিয়া'য় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে, দেশের খাদ্য গুদামে কার্যতঃ কোন খাদ্যশস্য নেই। বড় বড় শহর গুলিতে রুটির মূল্যও তুলনামুলকহারে বেড়েছে।

১৯৯৮ সালে রাশিয়ার প্রধান খাদ্য গমের মারাত্মক ফসলহানির ফলে এ খাদ্য সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে সে দেশে গম উৎপাদন হয়েছিল ৮ কোটি ৮৫ লাখ টন। আর ১৯৯৮ সালে উৎপাদন হয়েছে ৪ কোটি ৮৫ লাখ টন।

থাইল্যাণ্ডে কৃত্রিম বৃষ্টি

থাইল্যাণ্ডে পানি ঘাটতি তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। ৪৪টি প্রদেশের ৬০ লাখেরও বেশী মানুষ এ পানি স্বল্পতার কারণে দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ কথা জানানো হয়। উত্তরাঞ্চলীয় নাকর্ন সাওয়ান প্রদেশে কৃত্রিম বৃষ্টিপাত ঘটানোর জন্য বিমানের সাহায্যে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শুষ্ক বরফ, লবণ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যের একটি মিশ্রণ ছিটানো হয়। চীন থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে আসা মৌসুমী বায়ু প্রবাহের সহায়তায় সরকারের এ বৃষ্টিপাত ঘটানোর ফলে শুকিয়ে যাওয়া কৃষি জমি পুনরায় সতেজ হয়ে উঠে। উল্লেখ্য থাইল্যাণ্ডের এ অঞ্চলটিতে গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ পানি সংকট বিরাজ করছে।

কোয়ালিশন সরকার চালানো কঠিন

-বাজপেয়ী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী মনে করেন যে, কোয়ালিশন সরকার গঠন করা সহজ কিন্তু চালানো বড়ই কঠিন। ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত লোকসভায় দেয়া বাজপেয়ীর ৪০০ বক্তৃতার সংকলন সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এর ভূমিকায় বাজপেয়ী বলেন, 'কোয়ালিশনের শরীক দলগুলো যতদিন তাদের সীমাবদ্ধতা বুঝতে না পারবে, ততদিন কোয়ালিশন রাজনীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে না। এ অবস্থায় দেশ বারবার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কবলে পড়বে। ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন ঘটবে না, তেমনি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও সন্তোষজনক হবে না। উল্লেখ্য, ভারতে বর্তমানে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত।

স্কুলে গেলেই এক টাকা

ভারতের বিহার রাজ্যে গরীব শিশুরা স্কুলে গেলেই এক টাকা করে পাবে। সম্প্রতি ভারতের বিহার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ঘোষণা করেন যে, বিদ্যালয় গামী প্রত্যেক শিশুকে প্রতিদিন এক টাকা করে দেয়া হবে। জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে সকল গরীব পরিবারের সন্তানকে এ সুযোগ দেয়া হবে বলে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিবারের জন্য অর্থ যোগাতে গিয়ে এ রাজ্যের অসংখ্য গরীব শিশুকে পড়াশুনার শুরুতেই বিদ্যালয় ছাড়তে হয়। ঝরে পড়া এসব শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নেয়া এবং রাজ্যের সাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই অর্থ প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

দৃষ্টিক্ষীণতা তাইওয়ানে বেশী

তাইওয়ানের অধিবাসীরা বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন। দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই দৃষ্টিক্ষীণতায় ভুগছে। ন্যাশনাল তাইওয়ান ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়, ৬ষ্ঠ গ্রেডের ছাত্রদের অর্ধেক এবং জুনিয়র হাই স্কুলের ছাত্রদের ৭৫ শতাংশ ক্ষীণ দৃষ্টি সম্পন্ন। হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ লিন লুং কুয়াং বলেন, বিশ্বে তরুণদের মধ্যে দৃষ্টিক্ষীণতার সর্বোচ্চ হার সম্ভবতঃ তাইওয়ানে।

বৃটেনের ধূমপান সমাচার

বৃটেনে যেকোন দ্রব্যের উপরই সে দেশের অনুমোদন সূচক সীলমোহর রয়েছে। তবে সিগারেটের উপর এ সীলমোহর আর থাকছে না। অর্থাৎ সিগারেট সত্বর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে। শুধু এবছরের শেষপর্যন্ত এর অনুমোদন কার্যকর থাকবে। বৃটেনের যুবরাজ চার্লস ধূমপানের কট্টর বিরোধী। সর্বোপরি রাণী এলিজাবেথ কখনো ধূমপান করতেন কি-না কেউ জানেন না। তবে তার পিতা ধূমপান করতেন। যার ফলশ্রুতিতে তিনি ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা যান। বৃটেনের সিগারেট আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এ অনুমোদন উঠিয়ে নিলে কিছুটা হ'লেও বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। লক্ষ্যণীয় যে, বৃটেনে যারা ধূমপায়ী কর্মচারী তাদেরকে আড়াই ঘণ্টা বেশী কাজ করতে হয়। কারণ অফিসে যেহেতু ধূমপান নিষিদ্ধ তাই বাইরে গিয়ে ধূমপান করলে ১৫ মিনিট করে ব্যয় হয়। ধূমপান বিরোধী এ নীতি বাস্তবায়নে ধূমপায়ীদের জন্য নতুন চুক্তি করা হচ্ছে। কারণ ধূমপানের জন্য অফিসের সময় নষ্ট করতে দেয়া যাবে না। তাছাড়া সেদেশে বিমান, বাস, ট্রেন, ষ্টেশন, রেস্তোঁরা এসব জায়গায় ধূমপান আইনত দণ্ডনীয়।

*[বাংলাদেশের মুসলিম শাসকগণ বিষয়টির প্রতি কি **সক্রিয় দৃষ্টি নিক্ষেপ** করবেন? না কেবল প্রচারের মধ্যেই দায়িত্ব শেষ করবেন? -সম্পাদক]*

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম জাহান

বাদশাহ হোসেনের পরলোক গমন

দীর্ঘ ৪৭ বছরের বর্ণাঢ্য ও ঘটনা বহুল শাসক জীবনের অধিকারী জর্ডানের বাদশাহ্ হোসেন বিন তালাল গত ৭ ফেব্রুয়ারী আম্মানের একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন)। বাদশাহ'র ইন্তেকালের পর জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ আব্দুল্লাহ নতুন বাদশাহ হয়েছেন। বাদশা হোসেনের মৃত্যুতে জর্ডান সহ সারা বিশ্বে শোকের ছায়া নেমে আসে। ১৯৯২ সাল থেকেই ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন তিনি। ক্রমেই স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। মৃত্যুর পূর্বে কয়েকদিন কৃত্রিম শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল তাঁকে।

মৃত্যুকালে বাদশা হোসেনের বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। দীর্ঘ ৪৭ বছর তিনি বাদশা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৫৩ সালের ২রা মে যখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতাসীন হন তখন তাঁর বয়স ১৭ ছিল। তাঁর কমপক্ষে ১২টি ক্যু থেকে নিজকে সফলভাবে রক্ষা করেন। উগ্রপন্থী সন্ত্রাসী রাজনীতি, অভ্যুত্থান, হত্যা প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি ফিলিস্তিনী স্বার্থ রক্ষায় বাদশা হোসেন সদা সচেষ্ট ছিলেন। সর্বোপরি মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রতিষ্ঠায় তিনি সদা জাগ্রত ছিলেন। সে স্বীকৃতি হিসাবে তাঁর শেষ কৃত্যে বিশ্বের ৪০ জন সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধানসহ ৭৫টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি তাঁর কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে যান। ছুটে যান জাতিসংঘের মহাসচিবও। তাঁর মৃত্যুতে জর্ডানের অন্যতম শত্রু ইসরাইলের সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের সকলে উপস্থিত হন। সে দেশের জাতীয় পতাকাও অর্ধনমিত রেখে সম্মান দেখানো হয়। বাংলাদেশেও অনুরূপ সম্মান দেখানো হয়।

আসাদ পুনরায় সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফেয আল-আসাদ পঞ্চমবারের মত দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। প্রেসিডেন্টের কার্যকালের মেয়াদ ৭ বছর। গণভোটে প্রেসিডেন্ট আসাদ ৯১ লক্ষ ১ হাযার ১ শ' ৫৫ ভোটের মধ্যে প্রায় সব ভোটই পান।

বে-নামাজীর শাস্তি ঘোষণা

আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে কোন মুসলমান পুরুষ পাঞ্জেগানা ছালাত আদায় না করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। তালিবান কর্তৃপক্ষ এ ঘোষণা দিয়েছে। কাবুলের মসজিদগুলো থেকে মাইকের মাধ্যমে এ ঘোষণা দেয়া হয়। তালিবান সূত্র সমূহ জানিয়েছে, কোন পুরুষ মুসলমান যদি এ নির্দেশ অমান্য করে তাহ'লে তাকে শাস্তি দেয়া হবে। তবে এ শাস্তি কি ধরনের হবে, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে ধর্মীয় আলেমগণ বলেছেন, যারা নিয়মিত পাঞ্জেগানা ছালাত আদায় করবে না, তাদের প্রতিবেশীরা পুলিশকে জানালে পরে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। ছালাতের সময় সকল দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কর্তৃপক্ষ পশ্চিমা পোশাক বর্জন করে পুরুষদের দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ছালাতের সময় কোন দোকান খোলা থাকলে শাস্তি হিসাবে কয়েক দিনের জন্য সে দোকান বন্ধ রাখতে বাধ্য করা হবে। আফগানিস্তানের শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা বর্তমানে তালিবানদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

রুশদীর মৃত্যুদণ্ডের ফৎওয়া এখনো বহাল

ইরানের একটি রাজনৈতিক সংস্থা 'খোরদাদ ফাউণ্ডেশনে'র প্রধান আয়াতুল্লাহ হাসান গত ১১ ফেব্রুয়ারী বলেছেন, ১০ বৎসর পূর্বে মরহুম আয়াতুল্লাহ রূহুল্লাহ খোমেনী স্যাটানিক ভার্সেসের লেখক কুখ্যাত সালমান রুশদীকে হত্যা করার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, তা এখনো বহাল রয়েছে। তিনি আরো বলেন, ইসলাম ও ইসলামের নবীকে অবমাননা এবং কটাক্ষ করে সালমান রুশদী বই লিখে বিশ্বের মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে যে আঘাত হেনেছে, সেজন্য বিশ্বের অনেকেই তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত। আর আমরা তাদের উপযুক্ত পুরস্কার দিতে চাই। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে 'খোরদাদ ফাউণ্ডেশন' রুশদীকে হত্যা করার জন্য ৩০ লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

সঊদী আরবের শত তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

১৫ ফেব্রুয়ারী '৯৯ ছিল সঊদী আরবের শত তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। সঊদী আরব এবং সঊদী আরবের বাইরে বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে সঊদী দূতাবাসের উদ্যোগে বিশেষ জাকজমকের সাথে এ শত বার্ষিকী উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত সঊদী রাষ্ট্রদূত আব্দুল্লাহ ওমর বাররী তাঁর বাণীতে বলেন, 'আজ হ'তে শত বর্ষ পূর্বে বাদশাহ আব্দুল আযীয ইসলাম ধর্মের তথা সমগ্র মানব জাতির সেবার লক্ষ্যে এক মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অবিচলিত নিষ্ঠায় মাত্র কিছু সংখ্যক অনুগামীকে নিয়ে রিয়ায নগরী পুণর্দখল করেন। তিনি বলেন, সঊদী আরবকে একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ এবং ইসলাম ধর্মের প্রাণ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সকল সঊদী শাসক নিজেদেরকে উৎসর্গ করেন।'

উল্লেখ্য, আল্লাহ্‌র একত্ববাদ এবং পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্‌র নিকটে আত্মসমর্পণের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর বাদশাহ আব্দুল আযীয আধুনিক সঊদী আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার পূর্বে ১৩১৯ হিজরীর ৫ই শাওয়াল মোতাবেক ১৯০২ সালের ১৫ জানুয়ারী মাত্র ৬০/৭০ জন অনুগামী নিয়ে তিনি কুয়েত হ'তে রিয়াদ দখলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং রিয়াদের শাসক আজলানকে হত্যা ও পরাজিত করে রিয়াদ দখল করেন। তাঁর রিয়াদ দখল দেশের একত্রীকরণের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। তিনি দীর্ঘ ৩১ বছর যাবৎ একের পর এক যুদ্ধ চালিয়ে সমস্ত আরব উপদ্বীপের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ এলাকা নিয়ে ১৩৫১ হিজরী মোতাবেক ১৯৩২ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি 'কিংডম অফ সঊদী আরাবিয়া' নামে প্রায় ২২ লক্ষ ৪০ হাযার বর্গ কিঃমিঃ ব্যাপী এক বিশাল রাষ্ট্রের পত্তন করেন এবং ২৩ শে সেপ্টেম্বরকে সঊদী আরবের 'জাতীয় দিবস' হিসাবে ঘোষণা দেন। মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে সঊদী আরব আজ বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আসনে সমাসীন। ১৯৫৩

http://islaminonesite.wordpress.com

সালের ৯ নভেম্বর বাদশাহ আব্দুল আযীযের ইন্তেকালের পর তার সুযোগ্য সন্তানগণের উপর রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায়। একে একে বাদশাহ সঊদ বিন আবদুল আযীয (১৩৭৩-৮৪/১৯৫৩-৬৪), বাদশাহ ফায়ছাল বিন আবদুল আযীয (১৯৬৪-৭৫ খৃঃ), বাদশাহ খালেদ বিন আবদুল আযীয (১৯৭৫-৮২) ও তাঁর মৃত্যুর পরে বর্তমান বাদশাহ ফাহদ বিন আবদুল আযীয অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে রাষ্ট্র পরিচালনা করে যাচ্ছেন।

[সৌদি আরবের শত প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাদশা ফাহদ বিন আবদুল আযীয এবং যুবরাজ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আযীয সহ সে দেশের সকল ভাতৃপ্রতিম মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ। আমরা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সৌদি আরব রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাদশা আবদুল আযীযকে। তিনি আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং পবিত্র কুরআন ও রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র কাছে আত্মসমর্পিত করেছিলেন নিজেকে। যিনি ছিলেন, মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। বিশ্বের মুসলমানদের ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে সৌদি আরব বর্তমানের ন্যায় আগামীতেও নিরলস ভাবে কাজ করে যাবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সৌদি আরবের মর্যাদা আন্তর্জাতিক বিশ্বে আরও সুদৃঢ় হউক- আমরা সেই দো'আ করি। -সম্পাদক।]

চেচনিয়ায় শরীয়া আইন জারির সিদ্ধান্ত

চেচনিয়ার প্রেসিডেন্ট আসলান মাসখাদভ গত ৩রা ফেব্রুয়ারী চেচনিয়ায় ইসলামী শরীয়া আইন জারির সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। জনাব মাসখাদভ জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং সেনাবাহিনী সহ সমাজের সর্বস্তরে পবিত্র কুরআনের উপর ভিত্তি করে ইসলামী শরীয়া আইন বলবৎ করা হবে। টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে তিনি বলেন, 'আমি মুসলমানদের এবং এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী সবার প্রতি একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তুলতে ও এ প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে জিহাদ ঘোষণার আহবান জানাচ্ছি। তিনি বলেন, ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টি আগামী দু'মাস বিবেচনাধীন থাকবে এবং এটি বলবৎ করার আগে চেচেন জনগণের জাতীয় কংগ্রেসে পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হবে।

গ্যাস সিলিণ্ডার ব্যবহার না করতে হজ্জ যাত্রীদের প্রতি হুঁশিয়ারী

সঊদী আরব এ বছর হজ্জ পালন কালে মক্কা ও মদীনায় রান্নার কাজে গ্যাস সিলিণ্ডার ব্যবহার না করার জন্য হজ্জ যাত্রীদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছে। ইতিপূর্বে রান্নার সময় অসাবধানতার কারণে গ্যাস সিলিণ্ডার হতে সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। আর যাতে নতুন করে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত না হয় সে জন্য এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গ্যাস ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা আগামী ২২ মার্চ হ'তে কার্যকর হবে এবং তা বলবৎ থাকবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করতে হজ্জ যাত্রীদের গাড়ী ও বাসে তল্লাসী করা হবে। যদি কারু কাছে গ্যাস সিলিণ্ডার পাওয়া যায় তাহ'লে জরিমানা করা হবে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বাংলাদেশে ক্ষুদে বিজ্ঞানীর বিস্ময়

টর্চলাইটের রিমোট কন্ট্রোল আবিষ্কার। ভাবতে অবাক লাগার কথা। কিন্তু এ কাজে সফল হয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষুদে বিজ্ঞানী মোহাম্মাদ বাবুল আখতার জীম। লেখাপড়ার পাশাপাশি জীম বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনে মনোযোগ দেয়। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় জীম তার বাবার ক্যালকুলেটর খুলে নষ্ট করার মধ্য দিয়ে তার বিজ্ঞান যন্ত্র উদ্ভাবনের যাত্রা শুরু করে। তার তৈরীকৃত যন্ত্রপাতির মধ্যে রয়েছে লক সিকিউরিটি, অটোমেটিক ভোল্টেজ কন্ট্রোলার, রেগুলেটর, ডিজিটাল ভলিউম কন্ট্রোল, মশা নিধন যন্ত্র, চোর ধরার যন্ত্র, অটোনাইট ল্যাম্প, ডিসপ্লে, ইন্টারকম সহ অনেক ক্ষুদ্র ও বড় ধরণের যন্ত্রপাতি। জীমের তৈরি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ৬০ থেকে ৫০০ টাকার উর্দ্ধে নয়। জীম ইতোমধ্যে ইলেকট্রনিক্সের উপর একটি বইও প্রকাশ করেছেন।

জীমের বাবা আনোয়ার হোসেন পাবনা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড আদালতে চাকুরী করেন। জীম তার বাবার একমাত্র পুত্র। সে এবার এস এস সি পরীক্ষার্থী। জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতা '৯৮ এ বিজ্ঞান যন্ত্র সৃষ্টি প্রকল্পে অংশগ্রহণ করে এ ক্ষুদে বিজ্ঞানী জাতীয় পর্যায়ে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

ছায়াপথ জুড়ে ১৮ গ্রহ ও সহস্র কোটি সৌরজগৎ

এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তাছাড়াও আরো ১৮টি গ্রহ এবং এক কোটি থেকে এক হাযার কোটি সৌরজগৎ রয়েছে ছায়াপথ জুড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাসসেটস ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির অধ্যাপক ফিলিপ মরিসন সম্প্রতি এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এসব গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর কোনই মিল নেই। আর গ্রহগুলোর অবস্থান নির্ণয় করতে আগামী ১৫ থেকে ২০ বছর সময় লাগবে।

রসুনের কত গুণ (!)

প্রাচীনকালে মিশরের লোকেরা রসুন ব্যবহার করত ওষুধ হিসাবে। গ্রিক এ্যাথলেটরা শক্তিবর্ধক ভেষজ হিসাবে রসুন চুষে খেত। কিন্তু আমাদের উপমহাদেশে মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধরে। আর ইউরোপ-আমেরিকার হেল্‌থ ফুডের দোকানগুলোতে রসুন বেশী বিক্রি হয়। রসুনের বহুবিধ গুণের কথা জানলে কথিত গন্ধ গন্ধই মনে হবে না। তবে আজকাল রসুন বিভিন্নভাবে প্রক্রিয়াজাত করার ফলে এর গন্ধ আর থাকছে না।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হিপোক্রেটস্ এটি অনুমোদন করেছিলেন এর রোগ উপশমকারী গুণাগুণের জন্য। পরবর্তীকালে ফ্রান্সের বিজ্ঞানী লুই-পাস্তুর রসুনের

http://islaminonesite.wordpress.com

অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক উপাদান আবিষ্কার করেন।

রসুনের কতিপয় গুণঃ-

১. হার্টের অসুখ থেকে ক্যান্সার পর্যন্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে ।

২. টক্সিন সংক্রান্ত সমস্যাও উপশম করা সম্ভব।

৩. রসুনের নির্যাস রক্তের ফাইব্রিনোজেন হ্রাস করে যা উচ্চ রক্তচাপের জন্য দায়ী।

৪. বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে এটি বেশ কার্যকরী।

৫. দেহের জীবানু ধ্বংস করে সরাসরি এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।

৬. পাকস্থলীতে আলসার সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি প্রতিরোধেও রসুন কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৭. রসুন নিয়মিত খেলে লিভার ফাংশন খুব ভালো থাকে, তেমনি দেহে বিষক্রিয়া প্রতিরোধক এজেন্ট উৎপাদন করে।

৮. মহিলাদের যোনি প্রদেশে আক্রমণকারী ফাংগাল মাইক্রোব গুলোকে ধ্বংস করতে রসুন খুবই ফলপ্রদ।

স্বাস্থ্য এক রিপোর্টে দেখা গেছে যারা নিয়মিত রসুন খেয়েছে তাদের কোলেষ্টেরল মাত্রা ৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের বিপদজনক মাত্রার কোলেষ্টেরল শতকরা ৪৬ ভাগ কমে গিয়েছে।

রসুন নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। দু'এক কোয়া রসুন চুষে বা চিবিয়ে খাওয়া তেমন কোন ব্যাপার নয়। দুর্গন্ধের জন্য যদি কেউ খেতে না পারেন সে ব্যবস্থাও আছে। বাজারে রসুনের বিভিন্ন তৈরী খাদ্য পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে হলো- রসুনের আচার, গার্লিক ওয়েল। তাছাড়া পাওয়া যায় গার্লিক ওয়েলের ট্যাবলেট ক্যাপসুল এবং গার্লিক পাউডার।।

বাণী

আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষে দেশ ও বিদেশের মুসলিম ভাই ও বোনদের প্রতি আমাদের আন্তরিক মুবারকবাদ রইল। আত-তাহরীক -এর পাঠক পাঠিকাদের প্রতি রইল উষ্ণ অভিনন্দন এবং আহলেহাদীছ আন্দোলনের সাথী ভাই ও বোনদের প্রতি ও সোনামণি কচি-কাঁচাদের প্রতি রইল আমাদের প্রাণঢালা ভালোবাসা। সকলের প্রতি আমাদের নছীহত রইলঃ আসুন! আমরা স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করি। আল্লাহ্‌র আমানত, রাসূল (ছাঃ)-এর আমানত ও আন্দোলনের আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করি। আমরা যেন আল্লাহ্‌র নিকটে খেয়ানতকারী হিসাবে ধরা না পড়ি- আসুন! সেজন্য কায়মনোবাক্যে আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করি।

আহ্‌কার খাদেম

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

সাময়িক প্রসঙ্গ

১. আদালত অবমাননা?

২৮শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কলিকাতা বই মেলা উদ্বোধন করে গত ২৯শে জানুয়ারী দেশে ফিরে এসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রশ্নোত্তরের সময় দেশের হাইকোর্ট থেকে মাত্র দু'দিনে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির জামিন লাভ সংক্রান্ত বিষয়াদির ওপর কিছু বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যটি নিম্নরূপঃ

'গত ২৫ ও ২৬ আগষ্ট দু'দিনে ১২ শ' লোকের জামিন হয়ে গেল। কিভাবে হ'ল, কেন হ'ল, এটা কি কোন দিন হয়? যদিও বেঞ্চ পরিবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু প্রধান বিচারপতি এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেননি। যদি তদন্ত করা হতো এবং ব্যবস্থা নেয়া হতো তবে জুডিশিয়ারী অনেক দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেত। জুডিশিয়ারী সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ থাকতো না।'

উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতির সভাপতি এডভোকেট হাবীবুল ইসলাম ভূঁইয়া পিটিশনের মাধ্যমে ৩টি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ কামনা করেন। সেমতে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ আদালত অবমাননা সংক্রান্ত বক্তব্যের বিষয়ে দু'সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতি কামনা করে পত্র দেন। প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষরযুক্ত বিবৃতি ১৭ই ফেব্রুয়ারী আদালতে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় আদালত বিবৃতিটি প্রকাশ করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। তবে বিবৃতিটি প্রকাশ করা না হ'লেও প্রকাশিত তথ্যে জানা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর আদালত সংক্রান্ত বক্তব্যের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছেন এবং এজন্য তিনি কোনরূপ দুঃখ প্রকাশ করেননি।

প্রশ্ন জাগে, প্রধানমন্ত্রী কি তাহ'লে দেশের সর্বোচ্চ আদালতকেও চ্যালেঞ্জ করার ক্ষমতা রাখেন? আমরা তো জানি আদালত একটি নিরপেক্ষ বিচার সংস্থা। আদালতের দৃষ্টিতে দেশের সকল নাগরিক সমান। আর আদালতের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা দেখানোর দায়িত্ব দেশের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর। যদি তিনি তাতে ব্যর্থ হন, তাহ'লে অন্যেরা তো আদালতকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবে? দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির এই চরম অবনতিশীল অবস্থা আরও কোথায় গিয়ে গড়াবে তা কেউ ভেবে দেখেছেন কি? সচেতন নাগরিকদের নিকটে বিষয়টি ভয়ংকর বটে!

২. ভাষা দিবসঃ

২১শে ফেব্রুয়ারী ভাষা দিবস পালিত হ'ল। এ দিবসটি আমাদেরকে ১৯৫২ সালের সেই রক্তাক্ত দিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেদিন বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবীতে ছাত্র জনতা ঢাকার রাজপথে জঙ্গী মিছিল বের করে। অন্যদিকে গণবিক্ষোভ দমনের জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালিয়ে সালাম, বরকত, রফিক প্রমুখকে হত্যা করে ও অনেককে আহত করে। বিনিময়ে 'বাংলা' পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা লাভ করে এবং তখন থেকেই এদিনটি প্রতি বছর 'ভাষা দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

বিভিন্ন পত্রিকার ভাষ্য মতে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাব-গম্ভীর পরিবেশে রাজধানীসহ সারা দেশে অমর একুশে ভাষা শহীদ দিবস হিসাবে পালিত হয়েছে। জাতি এদিন ভাষা শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে। এ দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মীলাদ, কুরআনখানী ও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পন করে।

কোন স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য দিবস পালনই কি একমাত্র পন্থা? বরং তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আন্তরিক প্রয়াস চালানোই হ'ল মূল দায়িত্ব। এ কারণে ইসলামে দিবস পালনকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস, কুরআন নাযিল দিবস, হিজরত দিবস, বদর দিবস, চার খলীফার মৃত্যু দিবস ইত্যাদি দিয়েই বছরের ৩৬৫ দিন প্রায় কাটিয়ে দেওয়া যেত। দিবস পালনের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ ও কর্মঘণ্টা ব্যয়ের পরিবর্তে দিবসের মূল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মুসলিম উম্মাহ্কে ইসলাম তাকীদ করেছে। আল্লাহ বলেন, (হে রাসূল!) 'আপনি বলে দিন যে, তোমরা কাজ কর। অতি সত্বর তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিন সম্প্রদায়' (তওবাহ ১০৫)। ইসলাম তাই কাজ চায়। আমরাও ২১শে ফেব্রুয়ারীর মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন চাই।

১৯৫২ থেকে ১৯৯৯ এই দীর্ঘ ৪৭ বছরে বাংলা ভাষার কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে? সাক্ষরতার হার কতটুকু বেড়েছে? শিক্ষার মান ক্রমে অবনতির পথে। দেশের অধিকাংশ মুসলিম জনতার লালিত ইসলামী চেতনাকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। কোলকাতা কেন্দ্রিক ব্রাহ্মণ্যবাদী চেতনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এপার বাংলা ওপার বাংলার অখণ্ড ভৌগলিক সত্তায় বিশ্বাসী দেশের স্বাধীনতা বিরোধী সাহিত্যিকদের অনৈসলামী চেতনাকে 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ২১শে পুরস্কার সব যেন তাদের জন্যই একচেটিয়া। ইসলামপন্থী কবি-সাহিত্যিকগণকে 'রাজাকার-আলবদর ও স্বাধীনতা বিরোধী' বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে। অথচ ইসলামপন্থীরাই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী, যেকোন দেশপ্রেমিক সচেতন ব্যক্তি তা ভালভাবেই জানেন। ইসলামই হ'ল এদেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতার মূল চেতনা। সেই চেতনাকে শানিত করার মধ্যেই এদেশের স্বাধীনতা টিকে থাকার গ্যারান্টি রয়েছে, অন্য কিছুতে নয়।

আমরা বলি ২১শে ফেব্রুয়ারী, অথচ ৮ই ফাল্গুন বলিনা। সালাম-বরকত-রফিকের স্মৃতি রক্ষার জন্য শহীদ মিনার তৈরী করি। অথচ একবারও তাদের দুস্থ পরিবার গুলোর দিকে তাকাই না। শহীদ মিনার বানানো ও সেখানে রাত ১২-১ মিনিটে ফুল দেওয়া, নগ্ন পদ যাত্রা করা, প্রভাত ফেরী করা, রং ছিটানো, ঢোল-তবলা ও বাজনা নিয়ে একুশের গান গাওয়া ও মিছিল করা, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অনুরূপ স্থান সমূহে শহীদ বেদী বানিয়ে সেখানে লাল রং লাগিয়ে রক্তের আখর টানা, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো- এগুলি কোন্ সংস্কৃতি? এগুলো কি এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের লালিত ইসলামী সংস্কৃতি? না ওপার বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি? হিন্দু সংস্কৃতির লালন ও উন্নয়নের জন্য মুসলমানদের কষ্টার্জিত সম্পদ ব্যয় হবে কেন? হিন্দুদের পয়সায় যেমন মুসলমানেরা মসজিদ তৈরী করে না, ইসলামী জালসা করেনা, ঈদ উৎসব করে না। অনুরূপভাবে মুসলমানদের পয়সায় হিন্দুরা মন্দির করেনা, ধর্মীয় উৎসব করে না। উভয়ের মুখের ভাষা এক হ'লেও কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আলাদা। অতএব উভয় সংস্কৃতি সেবীর সাহিত্য দ্বিমুখী হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সংখ্যালঘুদের সংস্কৃতি সংখ্যাগুরুদের সংস্কৃতির উপরে চাপিয়ে দেওয়া, তাও আবার রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা নিঃসন্দেহে অন্যায় ও যুলুম। সংস্কৃতি পৃথক হ'লেও উভয় সাহিত্যিকগণ যৌথভাবে বাংলাভাষার উন্নয়নে এগিয়ে আসবেন, এটাই আমাদের একান্ত কাম্য।

পরিশেষে আমরা বাংলা ভাষায় মুসলিম সাংবাদিকতার জনক বাংলাকে ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার বিষয়ে ১৯৪৩. সালেই দাবী উত্থাপনকারী কলিকাতার দৈনিক ইত্তেহাদ সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, পদার্থ বিদ্যার প্রভাষক ও তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৭) অধ্যাপক আবুল কাসেম, রাজনীতিবিদ অলি আহাদ ও পরবর্তীতে সালাম, বরকত, রফিক সহ অন্যান্য ভাষা সৈনিকদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং সর্বস্তরের জনগণকে নিজ মাতৃভাষার উন্নয়ন ও সাহিত্য সেবায় এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

http://islaminonesite.wordpress.com

৩. পৌরসভা নির্বাচনঃ

বিরোধী দল সমূহ কর্তৃক নির্বাচন বয়কট ও আতংকময় পরিবেশের মধ্য দিয়ে সরকার একতরফা ভাবে দেশের ১৩৬ টি পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন করেছে। ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ফেব্রুয়ারী পৌর নির্বাচনের তিনদিন বিরোধী দলগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে ৬৬ ঘণ্টার হরতাল করে। ইতিপূর্বে ৯, ১০, ১১ ই ফেব্রুয়ারী ৬০ ঘণ্টার হরতাল হয় এবং তাতে তিন জন নিহত ও কয়েকশত ব্যক্তি আহত হওয়া ছাড়াও পুলিশ কর্তৃক বিরোধী দলের তিনজন এম,পি-কে পিটানো হয়। অতঃপর পৌরসভা নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে ২৩, ২৪, ২৫ শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় হরতাল ডাকা হয় ও নির্যাতন করলে ১ ও ২ মার্চ হরতাল করা হবে বলে আগাম হুঁশিয়ারী দিয়ে রাখা হয়। শেষের হরতালে ৫ জন নিহত ও অসংখ্য ব্যক্তি আহত ও পঙ্গু হয়েছে। বোমার আঘাতে একজন রিক্সাওয়ালার ডান হাত বাহুমূল হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ৭ জন এম, পি পুলিশের হাতে দৈহিকভাবে নির্যাতিত হয়েছেন। উপরন্তু বিরোধী দলের সোচ্চার কণ্ঠ সদ্য কারামুক্ত জাগপা নেতা শফিউল আলম প্রধানকে বন্দী করে ছিন্নমূল টোকাইদের সাথে একই সাথে হাজতে রেখে ও পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশ করে বিরোধী রাজনীতিকদের আরো বেশী অপদস্থ করা হয়েছে। বিরোধী দল এখন কিল খেয়ে কিল হযম করছে। সম্ভবতঃ আগে হুঁশ হয়নি যে, ৪ঠা মার্চ থেকে দেশব্যাপি এস, এস, সি পরীক্ষা শুরু হ'তে যাচ্ছে। সেজন্য ১ ও ২রা মার্চ হরতালের পূর্ব ঘোষণা বিফলে গেল। সরকারী দল একটা প্লাস পয়েন্ট পেল।

কিন্তু জাতি কি পেল? জাতি পেল কয়েকটা লাশ, কয়েকশত আহত পঙ্গু ও কয়েকশত কোটি টাকার জাতীয় ক্ষতি। কথায় বলে 'ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ করে দুর্বা গুলো ঘসায় মরে'। সরকারী ও বিরোধী দল আপোষে নেতৃত্বের লড়াই করছে। মাঝখানে জনগণ নির্যাতিত হচ্ছে, নিপীড়িত হচ্ছে, নিগৃহীত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে। এটাই হ'ল দলীয় রাজনীতি তথা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের তিক্ত ফল। ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি দেশে চালু করলে দেশ এইসব হরতাল, গাড়ীভাঙ্গা, হত্যা, লুণ্ঠন, নির্যাতন এবং প্রতিভা ও সম্পদের অপচয় থেকে রক্ষা পাবে ইনশাআল্লাহ। মুসলিম রাজনীতিকগণ কি একবার সেদিকে নযর দেওয়ার সময় পাবেন?

৪. কুয়েতের জাতীয় দিবসঃ

গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারী কুয়েতের জাতীয় দিবস পালিত হ'ল। আরব উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব অংশে পারস্য উপসাগরের উৎপত্তিস্থলে অবস্থিত এই ছোট্ট স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রটির অয়তন ১৭,৮১৯ বর্গ কিঃমিঃ ও লোক সংখ্যা ২.০৪ মিলিয়ন বা প্রায় ২১ লাখ। শাসক আল-সাবাহ পরিবার ১১৭০ হিজরী মোতাবেক ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহন করে। সেই থেকে বিগত ২৪৩ বৎসর যাবত এই বংশ স্বাধীনভাবে কুয়েত শাসন করে আসছে। পৃথিবীর শতকরা ২০ ভাগ খনিজ তৈল কুয়েতে সংরক্ষিত আছে। ১৯৪৬ সালে প্রথম তৈল উত্তোলন শুরু হয়। মুক্তা রফতানির জন্য এদেশের খ্যাতি আছে। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাচুর্যে ভরা এই দেশ মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে পৃথিবীর শীর্ষে অবস্থান করছে। রাজধানী কুয়েত সিটি দেশের প্রধান শহর ও বন্দর। ১৯৯০ সালের ২রা আগষ্ট প্রতিবেশী দেশ ইরাক অতর্কিতে এই দেশের উপরে হামলা করে রাতারাতি দখল করে নেয় ও একে ইরাকের ১৯তম প্রদেশ হিসাবে ঘোষণা দেয়। কুয়েতের আমীর শেখ যায়েদ আল-সাবাহ তখন পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র সউদী আরবে আশ্রয় নেন। অতঃপর শুরু হয় প্রতিরোধ ও পুণরুদ্ধার যুদ্ধ। স্বাধীন বিশ্ব মযলুম কুয়েতকে উদারভাবে সমর্থন দেয়। অহংকারে মদমত্ত ইরাক সর্বত্র ঘৃণা কুড়ায়। আমেরিকা-বৃটেন প্রভৃতি পরাশক্তি কুয়েতের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। ফলে কয়েক মাসের মধ্যে কুয়েত তার স্বাধীনতা ফিরে পায় ও ইরাক কুয়েত ত্যাগে বাধ্য হয়। কিন্তু যুদ্ধকালে আটক কুয়েতের বহু নাগরিক ইরাকের যিন্দানখানায় আজও বন্দী রয়েছে বলে জানা যায়।

খৃষ্টান পরাশক্তিটি তাদের রীতি অনুযায়ী সম্ভবতঃ উঠতি মুসলিম শক্তি ইরাকের শক্তি খর্ব করার জন্য ক্ষমতাগর্বী প্রেসিডেন্ট সাদ্দামকে কুয়েতের প্রতি গোপনে উস্কে দেয় ও পরে কুয়েতের পক্ষ নিয়ে সাধু সেজে ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে ইরাকের সমর শক্তি ধ্বংস করার চেষ্টা চালায়। ইরাক কুয়েত ছেড়ে চলে গেলেও তার বিরুদ্ধে তখন থেকেই চলছে অর্থনৈতিক অবরোধ। ফলে লাখ লাখ মানুষ প্রতি বছর অপুষ্টি ও বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে। বর্তমানে সেখানে পুনরায় বিমান হামলা শুরু হয়েছে লাগাতারভাবে। অথচ আন্তর্জাতিক বিশ্ব নীরব। ওদিকে কুয়েত ও সউদী আরব সাদ্দামকে বিশ্বাস করতে পারছেনা। ফলে তারা পড়েছে উভয় সংকটে। বোকা ও অহংকারী সাদ্দাম এখনও কুয়েত ও সউদী আরবের বিরুদ্ধে হুমকি দিয়ে চলেছে। সে আজও আপন-পর চিনতে সক্ষম হয়নি। অদূরদর্শী নেতৃত্বের কবলে পড়ে মুসলিম জাতি এমনি করে যুগে যুগে মার খেয়েছে, আজও খাচ্ছে।

সউদী আরব ও কুয়েত বর্তমান বিশ্বে মুসলিম স্বার্থে অধিকহারে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে এবং উন্নয়নশীল মুসলিম দেশ সমূহের কল্যাণে সে উদারভাবে সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। আমরা কুয়েতের জাতীয় দিবসে সে দেশের সর্নৈঃ সর্নৈঃ উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করি।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫. শেখ হাসিনা মুখ্যমন্ত্রী?ঃ

সাংবাদিক ও কর্মকর্তাসহ ৮১ জন সফর সঙ্গীর বিরাট বহর নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৭শে জানুয়ারী'৯৯ কলিকাতায় বই মেলা উদ্বোধন করার জন্য গেলেন। ফিরে এলেন মেলা আয়োজকদের কাছ থেকে 'মুখ্যমন্ত্রী' লকব নিয়ে। এলেন শান্তি নিকেতনের আচার্য আই,কে, গুজরালের দেওয়া 'মঙ্গল তিলক' ও উপচার্য দিলীপ কুমার সিনহার দেওয়া 'স্বর্ণ সিঁদুর' কপালে নিয়ে। আরো নিয়ে এলেন ভারতের একটি সাধারণ সম্মাননা 'দেশীকোত্তম' ডিগ্রী নিয়ে। বললেন এমন একটি মঞ্চে যার 'মাথার উপরে মলিন সাদা রংয়ের এক খণ্ড যে কাপড়টি আলতো করে ঝুলছিল, চড়কের মেলার দরিদ্র দোকানীও তার চেয়ে ভাল কাপড় সংগ্রহ করে থাকেন' বলে বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশ। সাথী সহযাত্রী কবি-সাহিত্যিকগণ বিমান বন্দরে চরম অযত্নে-অবহেলায় পড়ে রইলেন। পরে নিজ নিজ উদ্যোগে হোটেলে গেলেন।

প্রধানমন্ত্রী গিয়েছিলেন তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে। কিন্তু কলিকাতা বিমান বন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাননি সেদেশের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী। বরং অভ্যর্থনা জানিয়েছেন পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য গভর্ণর ডঃ এ, আর, কিদওয়াঈ এবং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু। আন্তর্জাতিক প্রটোকল অনুযায়ী ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর গার্ড অব অনার ছিল তাঁর একান্ত প্রাপ্য। কিন্তু সেটাও তাঁকে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রীয় প্রধান অতিথির পরে অন্যকে বক্তৃতা করার সুযোগ দেওয়া আন্তর্জাতিক রীতিনীতির বরখেলাফ। কিন্তু দেখা গেল আমাদের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রধান অতিথির ভাষণের পরে ডাকা হ'ল আমাদেরই পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদকে। অতঃপর কাঠের ঘণ্টা পিটিয়ে মেলা উদ্বোধন করার জন্য ডাকা হ'ল বাংলাদেশের কবি শামসুর রহমানকে। তাঁরা নিজেরা এতে বিব্রত বোধ করেছেন। কিন্তু করার কিছু ছিল না। কলিকাতার সাংবাদিক সুমন চট্টোপাধ্যায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছেন যে, শেখ হাসিনাকে একাধিকবার 'মুখ্যমন্ত্রী' বলার পরও তার জন্য মঞ্চে কেউ দুঃখ প্রকাশ করেননি। ভারত ও বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষ যখন টিভি পর্দায় এই দৃশ্য দেখেছেন ও শুনেছেন, তখন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল, তা বুঝতে কারো বাকী থাকে কি? ভারত কি তাহ'লে বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তাকে মেনে নিতে পারেনি?

৬. বাদশাহ হোসেন চলে গেলেনঃ

জর্ডানের বাদশাহ হোসেন গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার রাজধানী আম্মানের 'বাদশাহ হোসেন মেডিকেল সেন্টারে' স্থানীয় সময় দুপর ১১-৫৮ মিনিটে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজে'উন)। ১৯৫২ সালে মাত্র ১৬ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করে দীর্ঘ প্রায় ৪৭ বছর দেশ শাসন করে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী শাসক বাদশাহ হোসেন দীর্ঘ দিন ক্যান্সার রোগ ভোগের পর মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর পরপরই তাঁর মনোনীত যুবরাজ জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুল্লাহ (৩৭) দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছেন। বাদশাহ হোসেনের অর্ধশতাব্দীকালের শাসন ছিল প্রজ্ঞা, সহিষ্ণুতা, ব্যক্তিত্ব ও মানবিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। হাশেমী বংশের এই রাজতন্ত্রী শাসক স্বীয় জনগণের চোখের মণি ছিলেন। বলা চলে যে, এটাই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে যখন জানা গেল যে, বাদশাহর দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো হ'য়ে গেছে। তখন হাযার হাযার নর-নারী আম্মানে উক্ত মেডিকেল সেন্টারের বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। সকলের এক দাবীঃ আমাদের দেহ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে বাদশাহ্‌র দেহে প্রতিস্থাপন করা হউক। আমরা মরি কিন্তু আমাদের প্রাণের বাদশাহ বেঁচে থাকুন! জনগণের এই আকুতি, এই ভালোবাসা কতজন নেতার ভাগ্যে জোটে? গণতান্ত্রিক বিশ্বে তো এর কোন প্রশ্নই ওঠে না।

মধ্যপ্রাচ্যে তিনি ছিলেন একজন সফল রাষ্ট্র নায়ক। রাজনৈতিক টাল-মাটাল সামাল দিয়ে পাশ্চাত্য বিশ্ব, ইসলামী ব্লক, আরব লীগ, সবদিকে ঠিক রেখে চলার মত সহিষ্ণুতা মধ্যপ্রাচ্যের শাসকদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আর সেকারণেই তাঁর মৃত্যুর পরে পত্রিকায় হেডলাইন আসে 'বাদশাহ হোসেনের কাফনের পাশে গোটা বিশ্ব'। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, সাবেক প্রেসিডেন্ট জেরাল্ড ফোর্ড, জিমি কার্টার ও জর্জ বুশ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জ্যাক শিরাক, বৃটেনের প্রিন্স চার্লস ও প্রধান মন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, জার্মানীর চ্যান্সেলর গেহার্ড শ্রোয়েডার, ভারতের ভাইস প্রেসিযেন্ট কৃষ্ণকান্ত, জাপানের যুবরাজ নারুহিতো ও প্রধানমন্ত্রী কেইজো ওবুচি, এমনকি ডাক্তারের উপদেশ উপেক্ষা করে রাশিয়ার অসুস্থ ও বৃদ্ধ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন প্রমুখ বিশ্বনেতারা যেমন ছুটে এসেছিলেন। তেমনি ইসরাঈলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শিমন পেরেজ ও আইজ্যাক শামির এবং বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইজার ওয়াইজম্যান ও প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তাঁর মন্ত্রীপরিষদ সহ অমুসলিম রাষ্ট্রনায়করাও তেমনি ছুটে এসেছিলেন আম্মানে। মুসলিম রাষ্ট্র সমূহের সম্ভবতঃ কোন রাষ্ট্র নেতাই বাদ যাননি। ৭৫টি দেশ থেকে আগত বিশ্ব নেতৃবৃন্দের এ শোক সম্মেলন একটি বিশ্ব নেতৃ সম্মেলনে রূপ নেয়। আম্মানের রাজপ্রাসাদ থেকে ২০ কিঃমিঃ দূরে রাঘদান প্রাসাদের অভ্যন্তরে পারিবারিক গোরস্থানে বাদশাহকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ হাযার হাযার শোকার্ত জনতা পরপারের যাত্রী বাদশাহ হোসেনের লাশের প্রতি সাশ্রু নয়নে মুহুর্মুহু তাকবীর ও দো'আ পড়ে বিদায় জানায়। বাদশাহ হোসেন জর্ডানের কেবল বাদশাহ ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন জর্ডান জাতির পিতা। সাধারণ জনগণের প্রাণের আকুতি তাঁর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসায় মিশে আছে। আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করি।

http://islaminonesite.wordpress.com

সংগঠন সংবাদ

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমাদের সার্বিক জীবন গড়ে তুলি

-ভোলার তাফসীর মাহফিলে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বোরহানুদ্দীন, ভোলাঃ গত ১,২,৩,৪ ও ৫ই ফেব্রুয়ারী'৯৯ স্থানীয় কাচিয়া-চৌমুহনী তা'লীমুল মিল্লাত মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট তাফসীর মাহফিলে প্রধান অতিথির ভাষণে সরকার ও জনগণের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সূরায়ে আল-আন'আমের ৪৮, ৪৯ ও ৫০ নং আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনগণের নিকটে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দাওয়াত নিয়ে আসেননি। তিনি কোন ভবিষ্যদ্বক্তা হিসাবে কিংবা নূরের তৈরী কোন ফেরেশতা হিসাবেও আবির্ভূত হননি। তিনি এসেছিলেন জিন্ন ও ইনসানের নবী হিসাবে মানুষকে জান্নাতের সুসংবাদ দিতে ও জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করতে। তিনি ছিলেন মানবজাতির হেদায়াতের জন্য আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ নবী। তিনি সার্বিক জীবনে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র অনুসরণ করতেন ও মানবজাতিকে অহি-র বিধান অনুযায়ী তাদের দৈনন্দিন জীবন পরিচালনা করার দাওয়াত দিতেন। দুর্ভাগ্য আজ আমরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনকেই আমাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা ও রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার মূল বিষয় হিসাবে গণ্য করেছি। অথচ নিজেদের ও নিজেদের জনগণের নৈতিক উন্নয়নের তেমন কোন চেষ্টা করিনি। অহি-র বিধানের পরিবর্তে নিজেদের রচিত বিধান জনগণের উপরে চাপিয়ে দিয়েছি। জনগণের অধিকার হরণ, প্রতিপক্ষ ও দুর্বলের উপর যুলুম ও জনগণের অর্থ লুটপাটের বিভিন্ন কলাকৌশল আবিষ্কারে আমরা পারঙ্গম হয়েছি। কিন্তু প্রকৃত মানুষ হ'তে পারিনি।

সমাজ উন্নয়নের নামে আমরা বিদেশী ও বিধর্মী এন,জি,ও গুলিকে গ্রামে-গঞ্জে কাজ করার অনুমতি দিয়েছি। তারা এখন অজ পাড়াগাঁয়ে স্কুল খুলছে। ৫০০/= টাকা বেতন দিয়ে ও বাচ্চাদের বইপত্র ফ্রি দিয়ে আমাদের শিক্ষিত বেকারদের ও কচি বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করছে ও আমাদের ঈমান-মন নষ্ট করছে। দুর্মুখেরা বলেন, আমাদের রাজনৈতিক নেতারাও তাদের কাছ থেকে বড় ধরণের ফাণ্ড সংগ্রহ করে থাকেন। সম্রাট জাহাংগীর (১৬০৫-২৭ খৃঃ) ইংরেজ বণিকদের এদেশে ব্যবসায়ের অনুমতি দিয়ে যে ভুল করেছিলেন, আমাদের নেতারাও সেই ভুল করছেন কি-না ভেবে দেখা কর্তব্য। উক্ত এলাকা থেকে নির্বাচিত এম,পি বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়েল আহমদের প্রতি তিনি বিশেষভাবে উক্ত আবেদন রাখেন।

তিনি বলেন, আমাদের পীর-ফকীরেরা তথাকথিত কাশ্‌ফ ও ইলহামের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বক্তা হওয়ার কসরত করে থাকেন ও নযর-নিয়ায নিয়ে টাকার বস্তা ভরে থাকেন। অথচ আল্লাহ্‌র সৃষ্টি তত্ত্ব ও নেয়ামতরাজি নিয়ে গবেষণা করার এমনকি সুন্নাত মোতাবেক সুস্থির ভাবে ও চোখের পানি ফেলে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের সময় তাদের নেই। মানুষকে দ্বীনের পথে দাওয়াত ও সমাজের উন্নয়ন মুলক কাজ থেকে দূরে থেকে নিজেদের আবিষ্কৃত মোরাকাবা-মুশাহাদা ও মুজাহাদার নামে হুজরা ও খানকায় মুখ লুকিয়ে নিজেদেরকে দুনিয়াত্যাগী হিসাবে যাহির করার বৃথা চেষ্টা করে থাকেন। অথচ আমাদের রাসূল (ছাঃ) অর্থ ভাণ্ডারের মালিক ছিলেন না। তিনি গায়েব জানতেন না। তিনি ফেরেশতাও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন আমাদেরই মত মানুষ। আমাদের ন্যায় সুখ-দুঃখের অধিকারী ও মানব চরিত্রের সর্বোত্তম প্রতিচ্ছবি। আমাদেরকে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি পেতে হ'লে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-কে উত্তম আদর্শ ও সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

তাফসীর মাহফিলের শেষদিনে তিনি 'সূরায়ে আলাক্ব' -এর প্রথম পাঁচ আয়াত থেকে তাফসীর পেশ করেন এবং ধর্মীয় ও বৈষয়িক শিক্ষার সমন্বয়ে দেশে একমুখী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, দ্বিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা থাকায় দেশে দ্বিমুখী চিন্তাধারার নাগরিক সৃষ্টি হচ্ছে। সামাজিক বৈষম্য ও আপোষে বিভেদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা আমাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা ব্যাহত করছে। তিনি কুরআন ও হাদীছের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা খাতে দেশের বাজেটের একটি বৃহদাংশ ব্যয়ের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। সাথে সাথে পবিত্র অহি-র শিক্ষাস্থল হিসাবে দেশের দ্বীনী মাদরাসাগুলির প্রতি উদারভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সরকার ও দানশীল মুমিন ভাইদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান।

তাফসীর মাহফিলের ১ম দিন ১লা ফেব্রুয়ারীতে বক্তৃতা করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র

http://islaminonesite.wordpress.com

নায়েবে আমীর সঊদী মাব'ঊছ শায়খ **আবদুছ ছামাদ সালাফী**। তিনি স্বীয় ভাষণে তাওহীদের ব্যাখ্যা পেশ করেন এবং বলেন যে, হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী দর্শনের সঙ্গে সূর মিলিয়ে আমরাও আল্লাহ্কে 'নিরাকার' বলি। এটা ঠিক নয়। বরং প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ্র আকার আছে। তবে তা কেমন সে কথা কেউ জানেনা। তিনি কারও তুলনীয় নন (শূরা ১১)। তিনি মু'তাযিলা দার্শনিকদের রায় ভিত্তিক ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করে ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে কুরআনের অর্থ বুঝার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

২য় দিন বক্তব্য রাখেন তাওহীদ ট্রাষ্ট, ঢাকা-এর কর্মী ও উদীয়মান বক্তা মাওলানা কফীলুদ্দীন। তিনি জনগণকে শিরক, বিদ'আত হ'তে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে আসার উদাত্ত আহ্বান জানান।

তাফসীর মাহফিলের ৩য় দিনে ঢাকা নাযিরাবাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম স্বীয় স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষণে সকলকে শিরক হ'তে দূরে থাকার আহ্বান জানান।

৪র্থ দিনে সাতক্ষীরার তরুণ বক্তা ও খুলনার চাঁদপুর সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ **মাওলানা জাহাংগীর আলম** মুসলিম সমাজে অনুপ্রবিষ্ট বিভিন্ন অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ হ'তে দূরে থেকে ইত্তেবায়ে সুন্নাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হাছিলের আহ্বান জানান।

৫ম দিনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের ভাষণের পরে শেষ বক্তা হিসাবে দীর্ঘ ভাষণ পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ও খুলনার রূপসা থানাধীন মোমেনডাঙ্গা সালাফিইয়াহ মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আবদুর রহীম। তিনি সনদ সহকারে বহু হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করে সমাজে প্রচলিত হাদীছ-বিরোধী রেওয়াজ সমূহের মূলোৎপাটনে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি অত্র মাদরাসার সাহায্যের জন্য আবেদন জানালে অনেকে তাঁর হাতে নগদ অর্থ প্রদান করেন।

পাঁচ দিন ব্যাপী বিরাট তাফসীর মাহফিলে আগমনের জন্য তাফসীর কমিটির পক্ষে অত্র মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ছফিউল্লাহ মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তিনি এবং উপস্থিত শ্রোতা মণ্ডলী মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে আগামীতে পুনরায় এখানে আগমনের জন্য বারবার আবেদন জানাতে থাকলে আমীরে জামা'আত তাঁদের আন্তরিকতাকে সম্মান জানিয়ে অবশেষে দাওয়াত কবুল করেন।

ভোলার সর্বজন পরিচিত **মাওলানা সিরাজুল হক শরীফ** প্রবীন ও বিজ্ঞ আলেম, প্রাক্তন উপযেলা চেয়ারম্যান সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাফসীর মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ভোলা আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক মাওলানা ফযলুল করীম, মাওলানা নূরুল হক, মাওলানা মোশার্রফ হোসায়েন আকন্দ, মাওলানা আবদুল হাই, মাওলানা নূর মোহাম্মাদ ফকীর ও অন্যান্য ওলামায়ে কেরাম॥

(খ) ওলামা সম্মেলনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠান সূচী অনুযায়ী বুরহানুদ্দীন থানাধীন কাচিয়া-চৌমুহনী তা'লীমুল মিল্লাত মাদরাসার হল ঘরে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টা হ'তে বিকাল সাড়ে ৫-টা পর্যন্ত ও পরদিন শুক্রবার বাদ ফজর হ'তে জুম'আ পর্যন্ত ওলামা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় উদ্যোক্তা ভাইদের প্রস্তাব ও সমর্থনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত উক্ত মহতী ওলামা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। দু'দিন ব্যাপী এই ব্যতিক্রমধর্মী ওলামা সমাবেশে ভোলা যেলার বিভিন্ন এলাকা হ'তে ৬০ জন আলেম যোগদান করেন। ঐদিন আশপাশের কয়েকটি মাদরাসা এতদুপলক্ষ্যে ছুটি ঘোষণা করা হয় বলে কয়েকজন শিক্ষক জানান। শুরুতে তেলাওয়াতে কালামে পাকের পর স্বাগত ভাষণ দেন মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা ও মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। অতঃপর সম্মেলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আরবীতে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন তাওহীদ ট্রাষ্ট, ঢাকা-এর দফতর সম্পাদক মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ফারেগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে আরবীতে ১ম শ্রেণীতে এম, এ, ডিগ্রীপ্রাপ্ত জনাব মাওলানা আকমাল হোসায়েন (রাজশাহী)।

অতঃপর সম্মানিত সভাপতি ছাহেবের নির্দেশক্রমে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ফারেগ ও কুয়েতের এহ্ইয়াউত তুরাছ, ঢাকা অফিসে কর্মরত তরুণ আলেম মাওলানা আকরামুয্ যামান (ঠাকুরগাঁও) তাওহীদ ও সুন্নাতের উপরে দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন। তার যুক্তিপূর্ণ ও দলীলভিত্তিক আলোচনায় উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম খুবই প্রভাবিত হন। তাঁর পরে মাওলানা আবদুর রহীম (বাগেরহাট) উছূলে হাদীছ তথা হাদীছ গ্রহণ ও বর্জনের মূলনীতির উপরে নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করেন। অতঃপর স্থানীয় দেউলা গ্রামের খ্যাতনামা আলেম ও বাগ্মী ও বর্তমানে ঢাকা মতিঝিল আল-আমীন জামে মসজিদের খত্বীব মাওলানা মোশার্রফ হোসায়েন আকন্দ 'কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে অপরাধীর শাস্তি বিধান এবং মুফতীগণের ফৎওয়া' বিষয়ে আকর্ষণীয় বক্তব্য পেশ করেন। তিনি ফৎওয়ায়ে আলমগীরী, ফৎওয়ায়ে ক্বাযীখান প্রভৃতি কেতাবের পৃষ্ঠা দেখিয়ে সেখানে উল্লেখিত অপরাধীর শাস্তি বিধান সংক্রান্ত হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহ সকলকে

http://islaminonesite.wordpress.com

পড়ে শুনান। অতঃপর তিনি ইসলামের নামে প্রচলিত 'তাহলীল' প্রথা ও যেনা-ব্যভিচার সংক্রান্ত বিষয় সমূহ ফিকহের পৃষ্ঠা ও উদ্ধৃতি সমূহ উল্লেখ করে সবাইকে শুনান ও সাথে সাথে বুখারী-মুসলিম প্রভৃতি ছহীহ হাদীছের সাথে সেগুলির সরাসরি বিরোধ সকলের সম্মুখে তুলে ধরেন। তিনি ছালাতের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' -এর পক্ষে চার খলীফাসহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী কর্তৃক বুখারী-মুসলিম ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত প্রায় ৪০৫০ হাদীছকে বর্জন করে কেবলমাত্র ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত একটি যঈফ হাদীছের উপরে আমল করার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, এটা স্রেফ আমাদের তাক্বলীদী গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত উক্ত হাদীছকে অধিকাংশ বিদ্বান 'যঈফ' বলেছেন। অথচ বুখারী ও মুসলিম সহ অন্যান্য ছহীহ হাদীছে তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের চার স্থানে রাফ'উল ইয়াদায়েন -এর অসংখ্য ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। একারণে ভারতগুরু শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) স্বীয় কালজয়ী গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ ২য় খণ্ডে ছালাত -এর আলোচনায় বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করেন, তিনি আমার নিকটে অধিকতর প্রিয় ঐ ব্যক্তির চেয়ে যিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন করেন না। কেননা রাফ'উল ইয়াদায়নের হাদীছ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর মযবুত'।

সম্মেলনের শেষাংশে মাওলানা আকরামুয্ যামান ও মাওলানা আবদুর রহীম উপস্থিত ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন প্রশ্নের জওয়াব দেন। অতঃপর সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, চার ইমামের দিকে সম্বন্ধ করে বিভিন্ন মাযহাবে রচিত ফেকহী মাসআলা সমূহের অধিকাংশ কিংবা সবটুকুই পরবর্তী যুগের ফকীহদের সৃষ্টি। কেননা অনুসরণীয় ইমামদের লিখিত কোন ফিকহ গ্রন্থ ছিলনা। তাঁদের মাসআলা-মাসায়েল যাচাই করার কোন বিশ্বস্ত সনদ নেই। তাই এগুলির সাথে চার ইমাম জড়িত নহেন। বরং তাঁদের সকলের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা হ'ল 'যখন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে, তখন জেনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব'(আবুদল ওয়াহ্হাব শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩)।

অতএব যিনি যত বেশী ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবেন, তিনি ততবেশী আবু হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারী হিসাবে বিবেচিত হবেন। আর ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ ও নিঃশর্ত অনুসারীগণই প্রকৃত প্রস্তাবে রাসূল (ছাঃ)-এর যথার্থ অনুসারী। অতএব আমাদেরকে পরবর্তীকালে সৃষ্ট মাযহাবী ফিকহ ও উছূলে ফিকহের বেড়াজাল হ'তে মুক্ত হয়ে তাকলীদ মুক্ত মন নিয়ে নিরপেক্ষ ও নিঃশর্তভাবে ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে। কেননা কবরে ও হাশরে কেউ আমাদের সাথী হবে না। নিজের ছহীহ-শুদ্ধ আমলই সেদিন একমাত্র পাথেয় হবে। কারু অসীলা ধরে বা দোহাই দিয়ে সেদিন মুক্তি পাওয়া যাবে না।

তিনি বলেন, চার ইমামের কেউ হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ তৃতীয় শতাব্দী হিজরী পাননি। তার আগেই তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন। ফলে সকল ছহীহ হাদীছ তাঁদের সংগ্রহে ছিল না। কিন্তু আমরা যারা উক্ত যুগের পরে জন্মগ্রহণ করেছি ও বাছাইকৃত ছহীহ হাদীছ সমূহ আমাদের সম্মুখে সংকলিত অবস্থায় মওজুদ রয়েছে, তাদের কোন অজুহাত নেই। ক্বিয়ামতের ময়দানে ইমামগণ দায়িত্ব মুক্ত হবেন। কিন্তু আমরা যারা ছহীহ হাদীছ পেয়েও আমল করি না, বরং বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাই, তাদের মুক্তির পথ কোথায়? ইমাম ও পীর ছাহেবরা কি আমাদের জন্য সেদিন সুপারিশ করবেন? সুপারিশের অধিকার যিনি পাবেন, তাঁর হাদীছ আমরা এড়িয়ে চলেছি ও ধর্মের নামে, ছওয়াবের নামে, নেকী হওয়ার নামে অসংখ্য শিরক ও বিদ'আতে আমরা জর্জরিত হয়ে পড়েছি। রাসূল (ছাঃ) তো হাউয কাওছারের কিনারা হ'তে 'সুহক্বান' 'সুহক্বান' দূর হও দূর হও বলে আমাদের তাড়িয়ে দিবেন (বুখারী মুসলিম, মিশকাত 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়, হা/৫৫৭১)। তাহ'লে সেদিন আমাদের মত গোনাহগারদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে কে সুপারিশ করবে? অতএব আসুন মৃত্যুর আগেই আমরা সাবধান হই এবং বাকী জীবনটা ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার সিদ্ধান্ত নিই। ভাষণের শেষে তিনি ওলামায়ে কেরামকে আন্তরিক মুবারকবাদ প্রদান করেন ও আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

স্থানীয় আলেমদের মন্তব্যঃ

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উক্ত আবেগময় ভাষণের পর তাফসীর মাহফিলের সভাপতি ভোলা অঞ্চলের খ্যাতনামা প্রবীন আলেম ও পীর **মাওলানা সিরাজুল হক শরীফ** স্বীয় বক্তব্যে বলেন, আজকের আলোচনা আমাদের জন্য খুবই ফলপ্রসু হয়েছে। আমরা বিনা দ্বিধায় একথা বলতে পারি যে, ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই। অন্যতম খ্যাতনামা আলেম ও আরবী কবি **মাওলানা আবদুশ শহীদ** একইভাবে মন্তব্য করেন ও এমনি ধরণের ইলমী আলোচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর স্থানীয় রামদাস ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান ও পরপর তিন বারের স্বনামধন্য চেয়ারম্যান ও বাহেরচর ইসলামিয়া সিনিয়র মাদরাসার অধ্যক্ষ, প্রসিদ্ধ আলেম ও বক্তা **মাওলানা আবুল হাশেম যুক্তিবাদী** সুন্দর ও সাবলীল ভঙ্গিতে যুক্তিগর্ভ আলোচনা তুলে ধরে বলেন,

http://islaminonesite.wordpress.com

এই আলোচনা আমার জীবনে সোনালী স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমরা কেতাব পড়েছি ও পড়িয়ে থাকি। কিন্তু সূক্ষ্ম আলোচনা ও গবেষণার সময় আমাদের নেই। তেমন সুযোগও নেই। আমরা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি। ইনশাআল্লাহ ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে আমাদের দৃঢ় আশা ও প্রতিজ্ঞা রইল। তিনি বলেন, এধরণের ওলামা সম্মেলন প্রত্যেক থানায় ও ইউনিয়নে করা উচিত। যাতে এই ছহীহ দাওয়াত সকলের নিকটে পৌঁছে যায়। একইরূপ মন্তব্য করেন বাউফল জয়নগর সিনিয়র মাদরাসার প্রবীণ অধ্যক্ষ **মাওলানা নূর মুহাম্মাদ ফকীর** ছাহেব। তিনি এই দাওয়াত সমস্ত ভোলা যেলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আলেমগণের প্রতি আহ্বান জানান।

(গ) জুম'আর খুৎবায় আমীরে জামা'আত

ওলামা সম্মেলন শেষে স্থানীয় কাচিয়া জামে মসজিদে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীগণ জুম'আর ছালাত আদায় করতে যান। মসজিদের ইমাম ও মুছল্লীদের দাবী ও অনুরোধে মুহতারাম আমীরে জামা'আত খুৎবা প্রদান ও ইমামতি করতে বাধ্য হন। খুৎবাতে তিনি বলেন, আমাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে যেভাবে অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ অনুপ্রবেশ করে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করেছে, আমাদের সাপ্তাহিক জুম'আর খুৎবাগুলিতেও সেই বন্ধ্যাত্বের ছোঁয়া লেগেছে। রাসূল (ছাঃ) আরবী ভাষায় খুৎবা দিতেন, সেই কারণে আমরাও আরবী ভাষায় লিখিত খুৎবা পাঠ করি। দুই খুৎবায় পাঁচ পাঁচ দশ মিনিট খুৎবা পাঠ করে এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানটিকে আমরা প্রাণহীন করে ফেলেছি। এর রূহকে আমরা হত্যা করেছি। অথচ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কেবল জুম'আর খুৎবার সময় নয়, সকল সময় আরবী ভাষায় কথা বলেছেন এবং কখনোই জীবনে বাংলায় কথা বলেননি। যদি তাঁর ভাষাকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়, তাহ'লে আমাদের সর্বদা সর্বাবস্থায় কেবল আরবী বলা উচিত। অথচ খুৎবা অর্থ ভাষণ। যার মূল কথা হ'ল উদ্ভূত বিষয়ে কুরআন ও হাদীছ-এর ব্যাখ্যা মুছল্লীদের সম্মুখে তাদের বোধগম্য ভাষায় পেশ করা (নাহ্ল ৪৪)। রাসূল (ছাঃ) কেবল আরবী ভাষীদের নবী ছিলেন না, তিনি বাংলা ভাষীদেরও নবী এবং বিশ্বনবী (সাবা ২৮)। বিশ্বের সকল ভাষার মানুষের নিকটে আল্লাহ প্রদত্ত অহি-র দাওয়াত ও ব্যাখ্যা পেশ করা তাঁর (ক্বিয়ামাহ ১৯) ও তাঁর ওয়ারিছ হিসাবে সকল আলেম ও খত্বীবের মৌলিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব প্রতি সপ্তাহে একবার খত্বীবকে আবশ্যিক ভাবে পালন করতে হয় জুম'আর খুৎবার মাধ্যমে। নইলে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা হ'তে মুমিন সমাজ বঞ্চিত হবে। এক সময় ইসলাম সমাজ থেকে বিদায় নেবে।

দুর্ভাগ্য ভুল ফৎওয়ার বেড়াজালে পড়ে এই ইসলামী খুৎবার ছওয়াব ও বরকত থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। উপরন্তু মুছল্লীদের মসজিদে আগমন ও নফল ছালাত আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে খুৎবার পূর্বে তৃতীয় আরেকটি বক্তৃতার বিদ'আতী অনুষ্ঠান চালু করে ছওয়াবের বদলে বরং গোনাহ উপার্জনের রাস্তা খুলে দিয়েছি। জুম'আর দিন খুৎবা ব্যতীত আরেকটি এধরণের ভাষণের অনুমতি ইসলাম আমাদেরকে দেয়নি। এটাকে ভাল কাজ মনে করেই আমরা চালু করেছি। আর ভাল কাজ মনে মরেই সকল বিদ'আত সৃষ্টি হয়েছে। শরীয়তের ভাষায় এটাই হ'ল বিদ'আত। কেননা এই ভাল কাজটির অনুমতি রাসূল (ছাঃ) দেননি। দ্বিতীয়তঃ খুৎবা হ'তে হবে উদ্ভূত বিষয়ের উপরে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের হেদায়াত সমৃদ্ধ। চান্দ্রমাস এখানে মুখ্য বিষয় নয়। তিনি বলেন, আমাদেরকে সকল বিষয়ে অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের দিকে মুখ ফিরাতে হবে। সেখান থেকেই আলো নিয়ে পথ চলতে হবে। আমাদের ছালাত, আমাদের ছিয়াম তথা আমাদের ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবন অহি-র বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হ'তে হবে। নইলে আমাদের সকল প্রচেষ্টা বৃথা যাবে।

খুৎবার পর জামা'আত দাঁড়িয়ে যাবার সময় যখন আমীর ছাহেব সকলকে পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করার হাদীছ শুনিয়ে দেন, তখন সকল মুছল্লী পরস্পরে সেভাবেই দাঁড়িয়ে গেলেন। সরবে আমীনের শব্দে মসজিদ গুঞ্জরিত হ'ল। সালাম ফিরানোর পরে আমীর ছাহেব সমাজে প্রচলিত সম্মিলিত দো'আ করলেন না। কিন্তু কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করলেন না। পরে অনেকে বললেন, আমাদেরকে **'রাফ'উল ইয়াদায়েন'** করে ছালাত আদায়ের নিয়মটি শিখিয়ে দিন। আমরা আজ থেকেই ছহীহ হাদীছের উপরে আমল শুরু করব। ঐ সময় আল্লাহ্র শুকরিয়া জানিয়ে আমাদের অনেকের চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে মসজিদের প্রতিবেশী ও মুতাওয়াল্লী মাওলানা ছফিউল্লাহ্র বাড়ীতে নাস্তা করে উক্ত মসজিদে মাওলানা ছফিউল্লাহ সহ স্থানীয় মুছল্লী ও সাতজন ওলামায়ে কেরাম মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নিকটে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বায়'আত গ্রহণ করেন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার অঙ্গীকার করেন। ফালিল্লা-হিল হাম্দ।

(ঘ) অন্যান্য তথ্যঃ

(১) মুহতারাম আমীরে জামা'আত ছাড়াও উক্ত সফরে যারা অংশগ্রহণ করেন তাঁরা হ'লেনঃ

১. শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী (রাজশাহী)
২. মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর)
৩. মাওলানা নূরুল হক (উদয়পুর, মুলাদী, ভোলা, বর্তমানে ঢাকা)।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪. মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলিম (দিনাজপুর)। প্রথম দু'জন তাফসীর মাহফিলে ১ম দিন ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অবস্থান করেন। ৩য় ও ৪র্থ জন আমীরে জামা'আতের সাথে ৩রা ফেব্রুয়ারী সকালে পৌঁছে একই দিনে রাত্রি শেষে চারজনের সকলে ঢাকা ও রাজশাহী রওয়ানা হন।

৫. মাওলানা আকরামুয্ যামানা (ঠাকুরগাঁও) ৬. মাওলানা জাহাংগীর আলম (সাতক্ষীরা)। এঁরা দু'জন ৩রা ফেব্রুয়ারী সকালে পৌঁছে ৫ই ফেব্রুয়ারী বিকালের লঞ্চে ঢাকা রওয়ানা হন। ৭. মাওলানা আবদুর রহীম (বাগেরহাট) ৮. আলহাজ্জ আবদুর রহমান (সাতক্ষীরা) ৯. আবদুর রহমান সানা (ঐ) ১০. বদরুল আনাম (ঐ) ১১. মাওলানা মুহাম্মাদ আকমল হোসায়েন (রাজশাহী) ১২. মাওলানা আবদুল হাই (উদয়পুর, ভোলা, বর্তমানে ঢাকা) ১৩ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট), ১৪. রবীউল ইসলাম (পাবনা) ১৫. মুহাম্মাদ ইব্রাহীম, (ঢাকা)। এঁরা সকলে আমীরে জামা'আতের সাথে ৬ই ফেব্রুয়ারী দুপুর ২-টায় 'সাদিম' লঞ্চ ধরে পরদিন সকাল পৌনে ৮-টায় ঢাকার সদরঘাট লঞ্চ টারমিনালে পৌঁছেন। মাওলানা আবদুর রহীম ও শফীকুল ইসলাম ঢাকার এক স্টেশন আগে মুন্সিগঞ্জের কাঠপট্টি স্টেশনে নেমে যান মোড়েলগঞ্জে পরবর্তী প্রোগ্রাম ধরার জন্য। ১৬. মাওলানা মোশাররফ হোসায়েন আকন্দ (দেউলা, বোরহানুদ্দীন, ভোলা, বর্তমানে ঢাকা) প্রোগ্রাম শেষ করে একদিন পরে ঢাকা ফিরে আসবেন বলে জানান।

(২) ২রা ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ঢাকার সদরঘাট থেকে গাজী-৪ লঞ্চ ধরে ৩রা ফেব্রুয়ারী সকাল সোয়া ৮-টায় যখন আমরা বুরহানুদ্দীন থানা লঞ্চঘাটে অবতরণ করি, তখন অভ্যর্থনাকারী সকলের নযর ছিল মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দিকে। কিন্তু পোষাকে-আষাকে পীর ছাহেবদের মত না দেখে অনেকেরই চিনতে কষ্ট হয়। পরে তিনি যখন লঞ্চ থেকে ট্রলারে নামেন, তখন অনেকেরই মন্তব্য ছিল 'মানুষটাকে দেখে বিরাট বিদ্বান মনে হয়'। এরপর সাধারণ পোষাকে লুঙ্গি-পাঞ্জাবী পরে তিনি যখন ওলামা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন ও সকলের সাথে উঠানে চাটাইতে বসে একত্রে খানা-পিনা করেন, তখন বিভিন্ন পীরের মুরীদদের ভক্তিপূর্ণ মন্তব্য সমূহ আমাদের কানে আসতে থাকে।

(৩) ৪ঠা ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে আমীর ছাহেবের প্রথম বক্তৃতা শুনে সাধারণ মানুষ এমন মুগ্ধ হয় যে, শেষের দিন তিনি বক্তৃতা করবেন কি-না জানার জন্য মাঠের সাধারণ দিন-মজুরেরা পর্যন্ত মাওলানা ছফিউল্লাহকে জিজ্ঞাসাবাদ করে 'আজকে আমীর হুযুর মঞ্চে আসবেন কি-না'। কেননা তারা গুজব শুনেছিল যে, আমীর ছাহেব ৫ তারিখ শুক্রবার বিকালের লঞ্চে ঢাকায় ফিরে গেছেন। অমনিভাবে সালাফী ছাহেবের নিকটে শোনা 'আল্লাহ্র আকার আছে' বক্তব্যটি এলাকায় ব্যাপক আলোচনার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়। সবাই বলাবলি করে যে, এমন কথা জীবনে এই প্রথম শুনলাম। এছাড়া আমীর ছাহেব ও নায়েবে আমীর ছাহেবের প্রশংসা বিমুখ বক্তব্য সকলের অন্তরে দাগ কেটেছে।

(৪) ফেরার পথে বুরহানুদ্দীনের পরে গঙ্গাপুর ষ্টেশন থেকে নূরুল ইসলাম নামক জনৈক মুড়ির মোয়া বিক্রেতা জনাব রবীউল ইসলাম (পাবনা)-এর নিকটে মোয়া বিক্রি করতে গেলে তিনি তাকে আমীর ছাহেবের কেবিনে নিয়ে আসেন। আমীর ছাহেব তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাশের সীটে বসিয়ে নছীহত করেন। ইতিপূর্বে প্রতিবেদকের বক্তব্য শুনে লোকটি গলায় ঝুলানো তিনটি বড় বড় মাদুলী খুলে আমীরে জামা'আতের নিকটে জমা দেয়। পরে তাঁর নছীহত শুনে ঐ ব্যক্তি নিজ হাতে লঞ্চ থেকে মাদুলীগুলি নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দুই বারে দেড় ঘণ্টার অধিক সময় ধরে সে আমীর ছাহেবের নছীহত শোনে ও যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত থেকে তওবা করে। ইতিপূর্বে তাফসীর মাহফিলে ও লঞ্চে অনেকে তাবীয খুলে জমা দেয়।

(৫) কাচিয়া-চৌমুহনী 'মুসলমান বাড়ী'র জনাব আবদুল হক ছাহেবের বাড়ীতে মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর সফর সঙ্গীগণ আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই বাড়ীর পূর্ব পুরুষ খুবই ধর্মপরায়ন ছিলেন বলেই বাড়ীটি 'মুসলমানবাড়ী' বলে খ্যাতি লাভ করে। আল্লাহ্র রহমতে তাঁদের সে সুনাম এখনো অক্ষুন্ন রয়েছে। ঢাকা-র উত্তর যাত্রাবাড়ীতে তাদের একটি সাত তলা বাড়ী রয়েছে। তাদের গ্রামের মসজিদে মাওলানা ছফিউল্লাহ্র আব্বা মুত্তাক্বী আলেম নিযামে মাওলানা আবুল হাশিম ছাহেবের আমল থেকে আজ পর্যন্ত সালামান্তে সম্মিলিত দো'আর প্রচলন নেই। গ্রামটি শাহবাজ পুর গ্যাসফিল্ড থেকে ২ কিঃমিঃ পশ্চিমে ও ভোলা শহর থেকে ২২ কিঃমিঃ ও বোরহানগঞ্জ বাজার থেকে ৩ কিঃমিঃ দক্ষিণে অবস্থিত।

(৬) ভোলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে যেসমস্ত উপদেশ দেন, তার শেষ দিকে বলেছিলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত নিয়ে আমরা ভোলা অঞ্চলে প্রথম সফরে যাচ্ছি। এই সফর হয় আমাদের জন্য শেষ সফর হবে, অথবা আগামী দিনের শুভ সূচনা হবে। মাওলানা নূরুল হক ও মাওলানা আবদুল হাইয়ের সহযোগিতায় আমরা ৩রা ফেব্রুয়ারী নিকটবর্তী শাহবাজপুর গ্যাসফিল্ড এবং ভোলা শহর ও আলিয়া মাদরাসা পরিদর্শন করি।

পরিশেষে বলব ভোলা সফরের সোনালী স্মৃতি আমরা কখনোই ভুলব না ইনশাআল্লাহ। এভাবে কোন নেতা ঐ অঞ্চলে আহলেহাদীছের দাওয়াত নিয়ে গিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। দিনের শুভ সূচনা হবে'। আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবাণীতে।

প্রতিবেদনেঃ
আবদুর রহমান সানা
দফতর সম্পাদক
সাতক্ষীরা সাংগঠনিক যেলা।

http://islaminonesite.wordpress.com

তিন দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ

বিগত ৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারী রোজ মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ১৯৯৯-২০০১ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠন উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রীয় কার্যালয় রাজশাহী নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম দিন সকাল ৯-০০টায় যথারীতি তেলাওয়াতে কালামে পাকের পর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ দেশের ৩১টি যেলা হ'তে আগত প্রায় ২০০ কর্মী ও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়ে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা আনফালের ২৭, ২৮ ও ২৯ আয়াতের আলোকে কর্মীদের চরিত্র সংশোধনের উপর দরসে কুরআন পেশ করেন। তিনি দরসে কুরআনে কর্মীদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত আমানত রক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন ও নিজ নিজ দায়িত্বে অবহেলা ও খেয়ানতের ভয়াবহ পরিণামের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, যারা আল্লাহ, রাসূল (ছাঃ) এবং মুমিনদের সাথে সকল প্রকার খেয়ানত থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ইখলাছের সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করে, আল্লাহ পাক তাদেরকে মহান পুরষ্কারে পুরষ্কৃত করেন। তাদেরকে আখেরাতে নাজাত দেন এবং তাদের গুনাহ সমূহ মাফ করে দেন। আল্লাহ্র রহমতের দরজা তাদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীরা হেদায়াত পেতে পারে। কিন্তু বিদ'আতী যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে খেয়ানত করে, তাদের হেদায়াতের পথ সহজ নয়। কেননা বিদ'আতী ব্যক্তি বিদ'আতকে নেকীর কাজ মনে করেই তা করে থাকে। তিনি সকলকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চলার উদাত্ত আহ্বান জানান।

মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দরসে কুরআনের পর পূর্ব নির্ধারিত বিষয় সমূহের আলোকে সম্মানিত প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রথম দিন সকাল ৬-০০টা হতে রাত ৮-০০টা পর্যন্ত এবং শেষ দিন সকাল ৬-০০টা হতে রাত ৯-০০টা পর্যন্ত কর্মী প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকে।

২য় দিন বাদ ফজর দরসে কুরআন পেশ করেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফ্তার সম্মানিত সদস্য **মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ**। তিনি সূরা নিসার ৫৯ আয়াতের আলোকে দরসে কুরআন পেশ করেন ও আমীরের আনুগত্যের শারঈ গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত দ্বিতীয় দিনে 'নেতৃত্বের গুণাবলী'-এর উপর প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে এক পর্যায়ে বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র যোগ্য নেতৃত্বে সংকটের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্য নেতৃত্বের সংকট দেখা দিয়েছে। অযোগ্য ও নীতিহীন ব্যক্তিগণ আজ ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করছে। তিনি বলেন, এমতাবস্থায় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কর্মীদের উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন হয়ে ভবিষ্যতে জাতিকে সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্ব উপহার দিতে হবে।

☆ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক **রেযাউল করীম** যুবকদের সংগঠিত করতে এবং আখেরাত মুখী করে গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা রাখেন। তৃতীয় দিন বাদ ফজর সূরা জুম'আর ২ ও ৩ আয়াতের আলোকে দরসে কুরআন পেশ করেন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সম্মানিত শিক্ষক ও দারুল ইফতার অন্যতম সদস্য **মাওলানা সাঈদুর রহমান**। এ প্রসঙ্গে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত্ব ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত সমাজ বিপ্লবের কথা তুলে ধরেন এবং সে পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। ঐদিন বাদ আছর প্রশিক্ষণে কর্মীদের জন্য উপস্থিত বক্তৃতা এবং এক্বামতে দ্বীনের উপর সামষ্টিক পাঠ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণের তৃতীয় দিন লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কাউন্সিল সদস্য পরীক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হয়। চূড়ান্ত বাছাইয়ে ১২ জন্য অনুমোদিত কর্মীকে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মানে উন্নীত করা হয়। অতঃপর তাদের আনুগত্যের বায়'আত গ্রহণ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

প্রশিক্ষণের শেষদিনে মুহতারাম আমীরে জামা'আত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (বগুড়া)-কে ১৯৯৯-২০০১ সেশনের জন্য কেন্দ্রীয় সভাপতি মনোনীত করেন এবং তার বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর কেন্দ্রীয় সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে পরামর্শ করে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও কর্মীদের মধ্য হ'তে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ গঠন করেন এবং তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। অতঃপর মাননীয় কেন্দ্রীয় সভাপতি যেলা সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন এবং তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শিশু-কিশোর

http://islaminonesite.wordpress.com

বিভাগ 'সোনামণি' সংগঠনের তিন সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করেন ও তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠান শেষে কেন্দ্র ও যেলা পর্যায়ের দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য পেশ করেন আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম। তাছাড়া বক্তব্য রাখেন যুবসংঘের বিদায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ এবং অর্থ সম্পাদক মোফাক্ষার হোসায়েন। অতঃপর সকলের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

পরিশেষে নবনিযুক্ত সভাপতি হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান তিনদিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনে আল্লাহ্র তাওফীক কামনা করে সকলকে নিয়ে সুন্নাতী দো'আ পাঠ করেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের ১৯৯৯-২০০১ সেশনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের নামের তালিকাঃ

ক্রমিক সংখ্যা	দায়িত্ব	নাম	সাংগঠনিক মান	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	সভাপতি	হাফেয মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (বগুড়া)	কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য	এম, এম, বি, এ (অনার্স) এম, এ রাঃ বিঃ
২.	সহ-সভাপতি	মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, (কুষ্টিয়া)	"	বি, এ (অনার্স) এম, এ (আরবী)
৩.	সাধারণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন (কুমিল্লা)	"	এম. এম (হাদীছ) এম,এ শেষ বর্ষ, ইসঃ ইতিহাস
৪.	সাংগঠনিক সম্পাদক	এ. এস, এম. আযীযুল্লাহ, (সাতক্ষীরা)	"	এম, এ শেষ বর্ষ বাংলা, রাঃ বিঃ
৫.	অর্থ সম্পাদক	মুহাম্মাদ শাহীদুয্যামান (সাতক্ষীরা)	"	এম, এম (হাদীছ) ৩য় বর্ষ, ইসঃ শিক্ষা
৬.	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর (সাতক্ষীরা)	কর্মী	এম.এস.এস (শেষ বর্ষ) অর্থনীতি. রাঃ বিঃ
৭.	দফতর সম্পাদক	মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, (গোপালগঞ্জ)	কেঃ কাউন্সিল সদস্য	২য় বর্ষ (সম্মান) ইসলামী শিক্ষা রাঃ বিঃ

১৯৯৯-২০০১ সেশনের বিভিন্ন সাংগঠনিক যেলার সভাপতিদের নামঃ

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	যেলার নাম	সাংগঠনিক মান	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন	নরসিংদী	কেঃ কাউঃ সদস্য	ফাযিল
২.	মুহাম্মাদ লিয়াকত আলী	খুলনা	"	কামিল
৩.	মুহাম্মাদ আনোয়ার এলাহী	সাতক্ষীরা	কর্মী	ফাযিল
৪.	মুহাম্মাদ সানোয়ার হোসাইন	মেহেরপুর	কেঃ কাউঃ সদস্য	ফাযিল
৫.	মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল	দিনাজপুর	"	এম, এম.(হাদীছ) বি.এ (অনার্স)
৬.	মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন	নাটোর	কর্মী	কামিল
৭.	মুহাম্মাদ মাজিদুল ইসলাম	কুষ্টিয়া (পঃ)	"	কামিল
৮.	মুহাম্মাদ আব্দুল বারী	যশোর	"	বি. এ. বি. এড
৯.	মুহাম্মাদ এনামুল হক	বগুড়া	"	কামিল
১০.	মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান	পাবনা	"	বি. এ. পরীক্ষার্থী
১১.	মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন	সিরাজগঞ্জ	"	কামিল
১২.	মুহাম্মাদ আব্দুল মোমিন	কুষ্টিয়া (পূর্ব)	"	"
১৩.	মুহাম্মাদ ওমর ফারূক	জামালপুর	"	ফাযিল
১৪.	মুহাম্মাদ আব্দুল মুত্তালিব	রাজবাড়ী	"	"
১৫.	আহমাদ শরীফ	কুমিল্লা	কেঃ কাউঃ সদস্য	বি. এস-সি
১৬.	হাফেয আব্দুছ ছামাদ	ঢাকা	"	দাওরা হাদীছ, ফারেগ মদীনা
১৭.	মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ	দিনাজপুর (পূর্ব)	"	বি. এস-সি.
১৮.	মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান	নীলফামারী	"	আলিম
১৯.	মুহাম্মাদ মোস্তাযির রহমান	লালমণিরহাট	"	দাওরায়ে হাদীছ
২০.	মুহাম্মাদ আকরাম হোসাইন	কুড়িগ্রাম	কর্মী	আলিম
২১.	মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন	গাইবান্ধা (পূর্ব)	কেঃ কাউঃ সদস্য	কামিল
২২.	মুহাম্মাদ মোস্তফা আলী	জয়পুরহাট	"	কামিল, বি.এ
২৩.	মুহাম্মাদ আবু মূসা আব্দুল্লাহ	নওগাঁ	কর্মী	আলিম
২৪.	মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম	গাইবান্ধা (পশ্চিম)	"	দাওরায়ে হাদীছ
২৫.	মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ	ঝিনাইদহ		উচ্চ মাধ্যমিক
২৬.	মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম	গাযীপুর		কামিল পরীক্ষার্থী
২৭.	মুহাম্মাদ তারীকুল হাসান	ময়মনসিংহ		২য় বর্ষ (সম্মান) রাষ্ট্রবিজ্ঞান
২৮.	আহমদ হোসাইন	সিলেট		
২৯.	মুহাম্মাদ আতাউর রহমান	রাজশাহী		৩য় বর্ষ (সম্মান) ইসলামের ইতিহাস

বাকী যেলা গুলিতে কেন্দ্রীয় সফরের পরে দ্রুত সভাপতি মনোনয়ন দেওয়া হবে। প্রকাশ থাকে প্রতি দু'বছর অন্তর ফেব্রুয়ারী মাসে নতুন সেশন শুরু হয়।

সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটিঃ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর শিশু-কিশোর বিভাগ সোনামণি-র তিন সদস্য বিশিষ্ট নিম্নোক্ত পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করেনঃ

ক্রমিক	নাম	সাংগঠনিক মান	শিক্ষাগত যোগ্যতা
১.	মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান (পরিচালক) (খুলনা)	কর্মী	বি, কম, এল.এল.বি
২.	আবু বকর ছিদ্দীক (রাজশাহী)	কর্মী	আলিম
৩.	শিহাবুদ্দীন (বগুড়া)	কর্মী	১ম বর্ষ (সম্মান) আরবী বিভাগ, রাঃ বিঃ

প্রকাশ থাকে যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আতের নির্দেশক্রমে মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান সেপ্টেম্বর'৯৪ থেকে অস্থায়ীভাবে সোনামণি-র পরিচালকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

পাঠকের মতামত

সঠিক পথের সন্ধান

হঠাৎ একদিন আমার বড় ছেলে ডাঃ হাবীবুর রহমান মাসিক 'আত-তাহরীক' জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যা আমার হাতে তুলে দেয়। খুব মনোযোগ সহকারে পত্রিকা দু'টি পড়ে শেষ করি। পত্রিকা দু'টো আমাকে এতই উদ্বুদ্ধ ও আকৃষ্ট করল, যা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। আমি হানাফী মতাবলম্বী হ'লেও আহলেহাদীছকে শ্রদ্ধা করতাম। তবে অনেক পূর্বে আমি তাদের বিদ্বেষের চোখেও দেখতাম।

আত-তাহরীকের মধ্যে আমার মনো জগতে লুক্কায়িত বহু প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পেলাম। **তাহরীক** মৃত ইসলামকে সঞ্জীবিত করে, ইহকালীন সমস্যা সমূহের মূল্যায়ন করে, পরকালীন মুক্তির পথ দেখায় ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আহবান জানায়। আত-তাহরীক সত্যিকার অর্থে নির্ভেজাল আদর্শের অবিরাম সামুদ্রিক ঢেউয়ের কল্লোল, যা সারা বিশ্বকে স্তব্ধ করে ছাড়বে। যদি 'আত-তাহরীক' আজও না পেতাম, আমার মনে হয় জাহান্নামও আমাকে পোড়াতে ঘৃণা করত। আমার এ অমূল্য জীবনকে ঢেলে সাজানোর জন্য কেউ যদি বৃহৎ অংকের ঋণ দিয়ে থাকে, তবে সেটি হ'ল 'আত-তাহরীক'।

পরকালীন মুক্তি ও ইহকালীন মঙ্গলের পথ 'আত-তাহরীকে' খুঁজে পেলাম। এ পত্রিকা আমাকে আহলেহাদীছ হ'তে বাধ্য করল। 'চুম্বক' যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে। অনুরূপভাবে 'আত-তাহরীক' আমাকে রাজশাহী 'হাদীছ ফাউণ্ডেশনে' যেতে বাধ্য করল। তাহরীকের প্রধান সম্পাদক সহ সকলের এই দ্বীনি খেদমতকে আল্লাহ কবুল করুন- আমীন।

-মাওলানা মাহফূযুর রহমান
গ্রামঃ মালোপাড়া, পোঃ পদ্মনাভপুর
থানাঃ হরিহর পাড়া,
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

হুঁশ ফিরলো

আহলেহাদীছ হওয়ায় আমি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হই। অনেকে আমাকে প্রচলিত রাজনীতির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে কাজ করার দাওয়াত দেয়, আবার অনেকে প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতে শরীক হওয়ার দাওয়াত দেয়। তাঁরা আমাকে এমনভাবে বলত যে, 'অনেক আহলেহাদীছও তো তাবলীগ জামা'আত বা জামা'আতে ইসলামী করে, তোমার অসুবিধা কি?' এর কোন জবাব আমি দিতে পারিনি। কিন্তু মাসিক **আত-তাহরীক** নভেম্বর'৯৮ ও ডিসেম্বর'৯৮ সংখ্যা পড়ে আমার হুঁশ ফিরলো। নভেম্বর'৯৮ সংখ্যার দরসে কুরআন -এ 'ইক্বামতে দ্বীন' প্রবন্ধের উপসংহার এবং ডিসেম্বর'৯৮ সংখ্যায় সম্পাদকীয় -এর 'দুর্ভাগ্য ইসলামী দল গুলোর......আমরা নেতৃত্ব দেইনা' পর্যন্ত পড়ে রাজনীতির সঠিক স্বরূপ কিছুটা হ'লেও বুঝতে পারলাম। এজন্য সম্পাদকীয় বিভাগকে ধন্যবাদ।

ডিসেম্বর'৯৮ সংখ্যার দরসে কুরআন -এ 'তাবলীগে দ্বীন' শীর্ষক প্রবন্ধে 'প্রচলিত তাবলীগ' শীর্ষক অংশটি পড়ে বুঝলাম বান্দার মধ্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মানার প্রবণতা সৃষ্টি করা তথা কালেমার হক্ব আদায় করার মানসিকতা সৃষ্টি করাই প্রকৃত তাবলীগ। আর এজন্য কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এবং এও বুঝলাম যে, প্রচলিত তাবলীগের ত্রুটি হ'লঃ (১) কিছু নির্ধারিত আমলের প্রতি আহ্বান (২) আমল গুলোর মাসায়েল বাদ দিয়ে ফাযায়েলের বর্ণনা (৩) ফাযায়েল বলতে গিয়ে প্রচুর যঈফ ও মওযূ হাদীছের অবতারণা (৪) মুরব্বীদের প্রতি তাক্বলীদে শাখ্ছী সৃষ্টি করা এবং মানুষকে তার সামাজিক বা পারিবারিক দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা।

ছহীহ তাবলীগ সম্পর্কে মাননীয় লেখকের বক্তব্য সত্যিই প্রশংসনীয়। আমরা এরূপ আরও লেখা আশা করব যেন পৃথিবীতে প্রচলিত সকল মতবাদের ত্রুটি জেনে আমরা তা থেকে বিরত থাকতে পারি।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান ছিদ্দীক
ডঃ যোহা কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

সুন্নাত ও বিদ'আত এক হ'তে পারেনা

সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, হক ও বাতিল যেমন এক হ'তে পারে না। তেমনি তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত এক হ'তে পারে না। যারা বিদ'আতকে বিদ'আত মনে করে না এবং বলে এটাও ঠিক ওটাও ঠিক তাদের এসব অপবিত্র কথা হ'তে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। আমাদের প্রিয় পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক তাওহীদ ও শিরক, সুন্নাত ও বিদ'আত এর মধ্যেকার পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপন করছে। ফলে আমরা সঠিক পথের সন্ধান পাচ্ছি। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক ও বিদ'আত বিহীন তাওহীদের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেওয়ার এবং এমন এক পথ ধরার তাওফীক দান করুন- যে পথ চলে গেছে সোজা জান্নাতের দিকে।

পরিশেষে হে আহলেহাদীছ ভাই সকল! আমরা উনাইযাতে আহলেহাদীছ আন্দোলনের কাজ করে চলেছি। অলসতার চাদর ছুড়ে ফেলে আপনারাও এগিয়ে চলুন। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দিন-আমীন!

মুনীরুল ইসলাম
উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টার
পোঃ বক্স নং -৮০৮
উনাইযাহ, সঊদী আরব।

[সম্মানিত লেখক পত্রের মাধ্যমে সঊদী আরব ও বাংলাদেশে মোট ১৬ জনের বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার চেক পাঠিয়ে আমাদের প্রীত করেছেন। এজন্য সম্পাদকীয় বিভাগের পক্ষ থেকে মাননীয় পত্র লেখক ও তার সকল সাথী ভাইদের জানাচ্ছি আন্তরিক মোবারকবাদ। লেখকের আবেগময় বক্তব্য সকল পাঠকের হৃদয়ে জিহাদী চেতনার উন্মেষ ঘটাবে ইনশাআল্লাহ। -সম্পাদক]

টক-ঝাল-মিষ্টি

*-দুররুল হুদা**
গ্রন্থ সমালোচক

*(১) 'আহলেহাদীছ সে যুগে এ যুগে' লেখক যুবাইর হোসাইন প্রকাশনায়ঃ মারকাযুদ দাওয়াতিল ইসলামীয়া ৯, মুহাম্মাদী প্রধান সড়ক, মুহাম্মাদী হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা ১২০৭। **প্রথম সংস্করণঃ** রবিউসসানী ১৪১৯ হিজরী আগষ্ট ১৯৯৮ ইং।*

উক্ত পুস্তিকাটি পাঠ করে দুঃখিত হ'লাম। লেখক 'আহলেহাদীছ' সম্পর্কে জনমনে ভুল ধারণা সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালিয়েছেন এবং দেশ ও বিদেশের খ্যাতনামা মনীষীদের ব্যাপারে কলম ধরেছেন। যা তার মত একজন ছাত্রের পক্ষে মোটেই শোভা পায়নি। তার জেনে রাখা ভাল যে, আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর লিখিত পি.এইচ.ডি থিসিসটি ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কর্তৃক রচিত। যিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে একজন সুপরিচিত ইসলামী ব্যক্তিত্ব। তাছাড়াও উক্ত থিসিসটি দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ও শিক্ষাপরিষদ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত এবং থিসিসটির মাননীয় তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষক মণ্ডলী সকলেই হানাফী মাযহাবের এবং দেশ ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়-এর স্বনামধন্য অধ্যাপক বৃন্দ। আমি মনে করি লেখক ছাত্রটির সামান্য ভদ্রতা জ্ঞান থাকলে তাঁদের মত বিদগ্ধ উস্তাদগণের বিরুদ্ধে কলম ধরার সাহস পেতেন না।

পরিশেষে লেখকের প্রতি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সম্পর্কে থিসিসটি নিরপেক্ষ মন নিয়ে পড়ুন। জ্ঞান সমুদ্রে ডুব দেওয়ার চেষ্টা করুন। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাবে। আশা করি আপনিও সত্বর মাযহাবী সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে নিরপেক্ষভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হিসাবে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যাবেন।

(২) মাসিক রহমানী পয়গাম, ৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা জুন'৯৮ -এর 'সতর্ক সাইরেন' কলামের 'বিভ্রান্তি ছড়ানোর জবাবে লা-মাযহাবীগণের নিকট কতিপয় প্রশ্ন' নিবন্ধে লেখক যে ১০টি প্রশ্নের অবতারণা করেছেন, তা পাঠে মাননীয় লেখকের ইলমী অযোগ্যতারই পরিচয় মেলে। লেখক যে প্রশ্নগুলো উত্থাপন করেছেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের জ্ঞানে কিছুমাত্র পরিপক্কতা থাকলে এর প্রতিটির উত্তর অতি সহজে পাওয়া সম্ভব। এ ধরনের উদ্ভট প্রশ্নের মাধ্যমে লেখক মুসলিম মিল্লাতকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত করারই অপপ্রয়াস চালিয়েছেন। প্রশ্নগুলো উপস্থাপনের পূর্বে লেখকের নিজেদের দিকে দৃষ্টি দেয়া উচিৎ ছিল।

মাননীয় লেখক! নিম্নোক্ত বিষয়গুলো একবার গভীর ভাবে ভেবে দেখুন!

আপনারা প্রচলিত চার মাযহাবের মধ্য হ'তে যেকোন একটি মান্য করা ফরয বলে যে দাবী করেন, তা পবিত্র কুরআনের কোন আয়াতে এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন হাদীছে আছে? আপনারা প্রত্যেক ছালাতে মনগড়া নিয়ত 'নাওয়াইতু আন' পাঠ করে থাকেন। এধরনের নিয়ত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর জীবদ্দশায় পাঠ করেছেন বলে প্রমাণ দিতে পারবেন কি? মীলাদ-ক্বিয়াম ইত্যাদি বিদ'আতী অনুষ্ঠানগুলো যা আপনারা করে থাকেন। তিনি কি এ ধরনের কোন অনুষ্ঠান পালন করেছেন? আপনাদের লিখিত ফিক্বহের গ্রন্থে বর্ণিত قال ابو حنيفه و عند ابو حنيفه ইত্যাদি উক্তি গুলোর কোন সনদ দেখাতে পারবেন কি? আপনারা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর লিখিত কোন গ্রন্থ দেখাতে পারবেন কি? সর্বোপরি আপনারা যে ইমাম ছাহেবকে মানেন বলে দাবী করেন, তিনি তো স্পষ্টভাবে মুসলিম মিল্লাতকে জানিয়ে দিয়েছেন, "اذا صح الحديث فهو مذهبى" 'যখন কোন ছহীহ হাদীছ পাবে, তখন সেটিই আমার মাযহাব' বলে ধরে নিবে। বন্ধুদের বলব, আপনারা কি তা করেন? যদি ইমাম ছাহেবের উক্ত উক্তিটি গ্রহণ করতেন, তাহ'লে মাযহাবপন্থী না হয়ে সরাসরি হাদীছপন্থী বা আহলেহাদীছ হয়ে যেতেন। অনুসরণ ব্যতীত কিভাবে অনুসারী হওয়া যায় তা আমাদের বোধগম্য নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ না মেনে নিজেদেরকে হানাফী বলে দাবী করা ইমাম আবু হানীফাকে অবজ্ঞা করারই শামিল বলে মনে করি।

আপনাদের অবশ্যই জানা আছে যে, মাযহাবী বাড়াবাড়ির কারণেই এক ও অখণ্ড মুসলিম মিল্লাত ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। হানাফী-শাফেঈ দ্বন্দ্বে ১২৫৮ খৃঃ ৬৫৬ হিজরীতে হালাকু খাঁর আক্রমনে বাগদাদের আব্বাসীয় খেলাফত ধ্বংস হয়ে যায়। অনুরূপভাবে বুরজী মামলুক সুলতান ফারজ বিন বারকুক -এর আমলে (৭৯১-৮১৫ হিঃ) ৮০১ হিজরী সনে মুকাল্লিদ আলেম ও জনগণকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলিম ঐক্যের প্রাণ কেন্দ্র কা'বা গৃহের চার পাশে চার মাযহাবের জন্য পৃথক পৃথক চার মুছাল্লা কায়েম করা হয়। এভাবে তাক্বলীদের কু-প্রভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র বিভক্তি স্থায়ী রূপ ধারণ করে। ১৩৪৩ হিজরীতে বর্তমান সঊদী শাসক পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয আল-সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে সকল মুসলমান বর্তমানে কুরআন-হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী একই ইব্রাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে এক সাথে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে।

পরিশেষে মাযহাবী বাড়াবাড়ির উর্ধে উঠে তাক্বলীদের পর্দা ছিন্ন করে নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়ে পরকালীন জীবন চির সুখময় করার মানসে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ -এর নিঃশর্ত অনুসারী হওয়ার উদাত্ত আহবান জানাই। আল্লাহ আমাদের সকলকে সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!!

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফ্‌তা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১)ঃ 'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকার আগষ্ট'৯৮ সংখ্যায় আহলেহাদীছ ও হানাফীর মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, 'আহলেহাদীছগণ পুরানো যুগের মানুষের রায়কে আমল না করে এযুগের বিভিন্ন আলেম, ডক্টর ও প্রফেসরগণের রায়কে হাদীছ হিসাবে প্রকাশ করে থাকেন' -এ সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য জানতে চাই।

-অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হাসান আলী (অবঃ)
বসুপাড়া, খুলনা।

উত্তরঃ আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে ঢাকা হ'তে প্রকাশিত সাপ্তাহিক-? 'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকার বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং আহলেহাদীছ ও হানাফীদের মাঝে সঠিক পার্থক্য হচ্ছে, আহলেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নেন। পক্ষান্তরে হানাফীগণ তাকলীদ পন্থী হওয়ার কারণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে তাদের লালিত মাযহাবের অনুকূলে হওয়া শর্ত করে থাকেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তাদের ইমামের রায় বা মাযহাবী ফৎওয়ার প্রতিকূলে অনুমিত হ'লে তা বিভিন্ন কৌশলে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা চালিয়ে থাকেন। অবশ্য তাদের কিছু আলেম এর ব্যতিক্রমও রয়েছেন।

আহলেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গ্রহণ করে থাকেন। তাই তাদের গৃহীত ফৎওয়া কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে হওয়ার সাথে সাথে সালাফে ছালেহীনের ফৎওয়ারও অনুকূলে হয়ে থাকে। ইসলামী বিদ্যায় পারদর্শী যেকোন পণ্ডিত ব্যক্তি এ বিষয়টি ভালভাবে অবগত আছেন।

প্রশ্ন (২/৮২)ঃ কোন এক ছেলে তার ভগ্নিপতির বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। এরূপ বিবাহ করা যাবে কি-না।

-আবূ বকর
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ভগ্নিপতির বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে। এতে শরীয়তে কোন বাধা নেই। যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম কুরআনে তাদের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে-

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

'এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সকল নারীকে হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে কামনা করবে তোমাদের মালের বিনিময়ে... (অর্থাৎ মোহরের বিনিময়ে)' -নিসা ২৪।

প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলা এ সমস্ত বৈধ মহিলাদেরই একজন। কাজেই তাকে বিবাহ করা শরীয়তে বৈধ।

প্রশ্ন (৩/৮৩)ঃ আমি আহলেহাদীছ জামা'আতের লোক। বিশেষ কারণে হানাফী এলাকায় থাকি। ছালাত আদায়ের সময় বুকে হাত বাঁধলে ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করলে সাধারণ মুছল্লীদের বাধার সম্মুখীন হই। এমনকি ২/৪ দিন আমার বুক থেকে হাত টেনে নামানোরও চেষ্টা করা হয়েছিল। এখানে আর কোন আহলেহাদীছ নেই। এখন আমি নাভীর একটু উপরে হাত বাঁধি ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করি না। ফলে এখন কোন সমস্যা হয় না। এ অবস্থায় আমার ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমীর হামযা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ শরীয়তের বিধান পালনে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে ঐ এলাকা ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। মুছল্লীদের বাধার মুখে আপনি বুকের উপর হাত বাঁধা ও রাফ'উল ইয়াদায়েন -এর মত ছহীহ হাদীছের আমল থেকে নিজেকে বিরত রাখছেন। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। আপনার উচিত হবে মুছল্লীদেরকে বুঝানো এবং এ সম্পর্কে দলীল সমূহ তাদের দেখানো। আশা করি তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক পাবেন, যারা গোঁড়ামী মুক্ত ও খোলা মনে ছহীহ হাদীছকে গ্রহণ করে নিবেন।

নবী করীম (ছাঃ) ছালাতে হাতের উপরে হাত বুকের উপরে বাঁধতেন। এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। *দেখুনঃ বুখারী ১/১০২ পৃঃ; ছহীহ ইবনু খোযায়মা হা/৪৭৯ বৈরুত ছাপা; আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি।*

খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান ইবনু হুমাম বলেন, বুকের নীচে বা নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। আলোচনা দেখুনঃ ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৯ পৃঃ (কায়রোঃ ছাপা ১৯৯২)।

রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছগুলি কেবল ছহীহ নয়, বরং 'মুতাওয়াতের' পর্যায়ভুক্ত। রাফ'উল ইয়াদায়েন

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পর্কিত হাদীছগুলি নিম্নে বর্ণিত হাদীছ গ্রন্থ গুলিতে বিশুদ্ধ সনদে পাবেন-

১. ছহীহ বুখারী পৃঃ ১০২; ২. ছহীহ মুসলিম ১/১৬৮ পৃঃ; ৩. নাসাঈ শরীফ ১/১১৭ পৃঃ; ৪. আবুদাঊদ ১/১০৪ ও ১০৬ পৃঃ; ৫. তিরমিযী ১/৩৫ পৃঃ; ৬. ইবনু মাজাহ ৬২ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৪; মুওয়াত্ত্বা মালেক ২৫ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খোযায়মা ১/২৩২; দারাকুতনী ১০৭-১১১ পৃঃ; বায়হাক্বী ২/৭৩। চার খলীফাসহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী বর্ণিত চারশত হাদীছের বিপরীতে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই 'যঈফ'। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা আহমাদ, আবুদাঊদ ও তিরমিযী শরীফে সংকলিত হয়েছে (মিশকাত হা/৮০৯)। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, এটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে, যা একে বাতিল প্রমাণ করে, (নায়ল ৩/১৪; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৮)। বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ ছালাতুল, (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)।

অতঃপর আপনি জানতে চেয়েছেন বুকে হাত না বেঁধে ও রাফউল ইয়াদায়েন না করে ছালাত হবে কি-না? একারণে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ হবে। আর জেনে শুনে ইনকার করলে ছালাত বাতিল হবে। আমাদের উচিত ছালাতকে ত্রুটি মুক্ত করে আদায় করা।

প্রশ্ন (৪/৮৪)ঃ অনেক আলেমকে দেখি সভা-সমিতিতে 'আল্লা-হুম্মা ছাল্লে'আলা সাইয়েদেনা মাওলা-না মুহাম্মাদ....' এই দরূদ পাঠ করেন। এই দরূদটি শরীয়ত সম্মত কি-না?

-আব্দুল হান্নান
গ্রামঃ চক কাযীযিয়া
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দরূদ পাঠের ফযীলত, গুরুত্ব ও স্থানের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রায় ৫০টিরও বেশী দরূদ পাঠ করার হাদীছ পাওয়া যায়। সাথে সাথে আরও ৭টি যঈফ ও বানোয়াট হাদীছও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দে কোন দরূদ পাওয়া যায় না। কাজেই উল্লেখিত শব্দে দরূদ পাঠ ভিত্তিহীন।

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রাঃ) বলেন, আমার সাথে কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ)-এর সাক্ষাত ঘটলে তিনি বলতে লাগলেন, আমি কি তোমাকে ঐ হাদিয়া দান করব না, যা আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেছি। আমি বললাম, কেন নয়? অবশ্যই উহা আমাকে দান করুন! কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলতে লাগলেন, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সমীপে আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন, তবে কিরূপে আপনার প্রতি ও আহলে বায়েত-এর প্রতি দরূদ পাঠ করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এ সমস্ত শব্দাবলী দ্বারা দরূদ পাঠ কর- 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা ছাল্লায়তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'। *-বুখারী 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, হা/৬৩৫৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯।*

উপরন্তু ইসলামী জালসা ও মীলাদের মাহফিলে যেভাবে হেলে দুলে সুর দিয়ে দরূদ পাঠ করা হয়, তাতে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য দো'আর আকুতি থাকেনা। বরং থাকে সুরের লহরী। মীলাদের মজলিসে তো দাঁড়িয়ে 'ইয়া নাবী সালাম আলায়কা' বলে সরবে সমস্বরে বানোয়াটী দরূদ পাঠ করা হয়- যা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। এতে ছওয়াব দূরে থাক গুনাহের আশংকাই বেশী।

প্রশ্ন (৫/৮৫)ঃ হাঁটুর উপর কাপড় উঠানো হ'লে নাকি ফরয তরক করা হয়। ইদানিং এ সম্বন্ধে খুব বেশী শুনা যায়। সঠিক ব্যাপারটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সাং সন্ন্যাসবাড়ী
পোঃ বান্দাইখাড়া
যেলাঃ নওগাঁ।

উত্তরঃ হাঁটুর উপর কাপড় উঠালে ফরয তরক হয় কথাটি ঠিক নয়। বরং প্রয়োজন বোধে হাঁটুর উপর কাপড় উঠানো যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) উরু অথবা পায়ের নলার উপর হ'তে কাপড় উঠানো অবস্থায় নিজ গৃহে শুয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আবুবকর (রাঃ) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় থাকলেন ও কথা বললেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) এসে অনুমতি চাইলে তাকেও অনুমতি দিলেন এবং ঐ অবস্থায় তার সাথেও কথা বললেন। এরপর ওছমান (রাঃ) এসে অনুমতি চাইলে রাসূল (ছাঃ) উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক

করলেন। -*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৬০ পৃঃ।*

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) খায়বার অভিযানে বের হ'লেন এবং আমরা সেখানে পৌঁছে ভোরে অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহন করলেন। আবু ত্বালহাও সওয়ারীর উপর আরোহন করলেন। আমি তাঁর পিছনে বসলাম। রাসূল (ছাঃ) খায়বারের গলি পথে দ্রুত চলতে থাকলেন এবং আমার হাঁটু তার উরু স্পর্শ করতে লাগল। তারপর উরু হ'তে লুঙ্গি সরে গেলে আমি তা লক্ষ্য করলাম। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এখনও তাঁর উরুর শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। -*বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃঃ।*

উক্ত হাদীছ দ্বয় প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে হাঁটুর উপর কাপড় উঠানো যায়। তবে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা উত্তম। জারহাদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, উরু গোপন অঙ্গসমূহের অন্তর্ভুক্ত। -*বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃঃ তরজমাতুল বাব।*

প্রশ্ন (৬/৮৬)ঃ মৃতব্যক্তির দাফনের পর কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-মাষ্টার আয়নুদ্দীন
বালীজুড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ মৃতব্যক্তির দাফনের পর কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবেনা। এরূপ আমল বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। সম্মিলিতভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করার রাসূল (ছাঃ) থেকে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, যাকে 'জানাযা' বলা হয়। সেখানে মৃত ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন প্রার্থনা করা হয়। সাথে সাথে মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর মৃতব্যক্তি যেন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হ'তে পারেন, সেজন্য সকল মুছল্লীকে ব্যক্তিগত ভাবে দো'আ করতেও বলা হয়েছে। হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন দাফন কার্য শেষ করতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন ও মুছল্লীদের বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তার দৃঢ় থাকার জন্য দো'আ কর। কেননা তাকে এখনি জিজ্ঞেস করা হবে'। -*আবুদাঊদ, মিশকাত ২৬ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ।*

যেহেতু মৃতব্যক্তির দাফনের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় সেহেতু প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করে মৃতব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য সকলে পৃথক পৃথক ভাবে দো'আ করাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুকূলে হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৭/৮৭)ঃ আক্বীক্বা দেয়ার পর ধাত্রীমাতাকে ছাগলের রান ও সপ্তম দিবসে শিশুর গলায় রূপার চেইন দেয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী সালাফী
ইকরা পাঠাগার
ধানীখোলা, ত্রিশাল
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ আক্বীক্বা দেয়ার পর ধাত্রীমাতাকে ছাগলের রান দেয়া ও আক্বীক্বার গোশত বণ্টন করার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। অনুরূপভাবে জন্মের সপ্তম দিনে গলায় রূপার চেইন দেয়ারও কোন হাদীছ নেই। কাজেই এরূপ রেওয়াজ পরিতাজ্য। অবশ্য জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের কর্তনকৃত চুলের সমপরিমাণ রূপা বা তার মূল্য ছাদক্বা করা সুন্নাত। -*তিরমিযী, তোহফা ৫ম খণ্ড 'আক্বীক্বা' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ।*

প্রশ্ন (৮/৮৮)ঃ আমাদের এখানে কয়েকজন আলেম ও হাফেয আছেন। আর একজন বেতনভুক আলেম আছেন। এমতাবস্থায় ইমাম কে হবেন? বেতনভুক ব্যক্তি না অন্য কেউ।

-মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
সাং ও পোঃ দিগদানা
যেলাঃ যশোর।

উত্তরঃ আবু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি যে কুরআন ভাল পড়ে। যদি সকলেই কুরআন পড়ায় সমান হয়, তবে যে সুন্নাত বেশী জানে। যদি সুন্নাত জানায় সকলেই সমান হয়, তবে যে হিজরত আগে করেছে। যদি হিজরতেও সমান হয় তবে যে বয়সে বেশী। কেউ যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতা স্থলে ইমামতি না করে এবং তার অনুমতি ব্যতীত তার সম্মানের স্থানে না বসে'। -*মুসলিম, মিশকাত ১০০ পৃঃ।*

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে তখন যেন তাদের মধ্য হ'তে একজন ইমামতি করে এবং ইমামতির অধিকারী তিনিই যিনি কুরআন অধিক ভাল পড়তে পারেন। -*মুসলিম, মিশকাত ১০০ পৃঃ।*

হাদীছ দ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, যিনি সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে পারেন তিনিই ইমাম হবেন। যদি কুরআন ভাল পড়ায় সকলে সমান হন তাহলে যিনি কুরআন-হাদীছের জ্ঞান বেশী রাখেন। যদি

http://islaminonesite.wordpress.com

কুরআন-হাদীছের জ্ঞানে সকলে সমান হন, তাহ'লে যার বয়স বেশী তিনি ইমাম হবেন। কাজেই আপনারা হাদীছের দৃষ্টিকোন থেকে ইমাম নির্ধারণ করবেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব নির্ধারিত ইমামই ইমাম হওয়ার প্রকৃত হকদার। তবে ইমামের অনুমতিক্রমে অন্য যোগ্য ব্যক্তি ইমামতি করতে পারেন।

প্রশ্ন (৯/৮৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দর্শন সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, ইহা সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য। কোনটা ঠিক জানতে চাই?

-মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
সাং- বামন গ্রাম
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মানুষ যে কোন যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পারে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নবুঅতের কোন চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে শুধু সুসংবাদ বহনকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সুসংবাদ বহনকারী কি? তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন'। *-বুখারী, মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ।* হাদীছটি প্রমাণ করে যে, ভাল স্বপ্ন বাকী রয়েছে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে সত্যিই আমাকে দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৯৪।*

উল্লেখিত হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সর্বযুগেই মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পারে এবং শয়তান তার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে অন্য আকৃতি ধারণ করে শয়তান নবীর পরিচয় দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ফলে যে ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে তাঁর স্বীয় রূপে দেখবে, সে নিশ্চিত ভাবেই রাসূল (ছাঃ)-কে দেখবে।

প্রশ্ন (১০/৯০)ঃ ছালাতের সঙ্গে ছিয়ামের সম্পর্ক কি? 'রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় ছালাত আদায় না করলে ছিয়াম মূল্যহীন' কথাটা কতটুকু সঠিক? কুরআন-হাদীছের আলোকে -এর সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যয়েনুদ্দীন সরকার
বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছিয়ামের নিয়তে শুধু সারাদিন পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম সাধনা নয়। বরং ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার অনৈসলামী ও মিথ্যা থেকে কঠোর ভাবে বিরত থাকা। অন্যথায় ছিয়াম প্রায় মূল্যহীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ, (অন্য বর্ণনায়) অনৈসলামী কাজ থেকে বিরত না থাকে, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই। *-বুখারী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৯, হা/১৯০৩।*

ছিয়াম অবস্থায় অন্যান্য ইবাদত বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত নিয়মিত আদায় করা ফরয। উক্ত ফরয তরক করে শুধুমাত্র ছিয়াম পালন করা মূল্যহীন। কেননা ছালাত-এর উপরেই অন্যান্য সকল ইবাদত কবুল হওয়া অনেকটা নির্ভর করে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

"اول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصلوة فإن صلحت صلحت سائر عمله و إن فسدت فسدت سائر عمله روای الطبرانی

'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সুষ্ঠু হবে। নইলে সবকিছুই বেকার হবে'। *-তাবারাণী আওসাত্ব, হাদীছ ছহীহ।* সুতরাং ছালাত ব্যতীত ছিয়াম যে মূল্যহীন তা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন (১১/৯১)ঃ গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে 'জনগণের আইন' যা থেকে আল্লাহ্‌র আইন বোঝায় না। এমতাবস্থায় প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারাকে সমর্থন করে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে মুক্তি হাছিল কি সম্ভব? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-তোফায়েল আহমাদ
জগৎপুর এ,ডি,এইচ সিনিয়র মাদরাসা
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে কিংবা সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে পরকালে মুক্তি পাওয়া ও না পাওয়ার বিষয়টি তার সমর্থন ও আমলের নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সে যদি আল্লাহ্‌র আইনকে অবিশ্বাস ও অসত্য মনে করতঃ প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন কিংবা সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তবে তওবা ব্যতীত পরকালে তার মুক্তি পাওয়ার কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্ভাবনা নেই। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়ছালা প্রদান করে না তারা কাফের' (মায়েদা ৪৪)।

আর যদি আল্লাহ্র আইনের প্রতি বিশ্বাস রেখেও ঈমানের দুর্বলতার কারণে বা কোন পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্র আইনের পরিবর্তে প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এরূপ ব্যক্তিকে ফাসেক কিংবা যালেম বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দ্বীন ইসলাম তথা কোন শারঈ বিধানের অস্বীকার কারীকে কাফের বলা হয় এবং শারঈ বিধানকে স্বীকার করতঃ তা লঙ্ঘনকারী কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে 'ফাসেক' বলা হয়।

অতএব প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন কিংবা সে অনুযায়ী জীবন যাপন কবীরা গোনাহ হ'লেও মুমিন ব্যক্তি এরূপ গোনাহেরও ক্ষমা ও পরকালে মুক্তি পেতে পারে। যদি আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং সে ব্যক্তি শিরক না করে থাকে।

প্রশ্ন (১২/৯২)ঃ কোন কোন মাদরাসায় দেখা যায় যে, হেফ্য শেষ করে ফারেগ হওয়ার সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাত্রের মাথায় পাগড়ী পরানো হয়। কিন্তু ফারেগের পূর্বেও মাদরাসায় ছেলেদের পাগড়ী পরতে দেখা যায় না কিংবা অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া পরেও পাগড়ী পরতে দেখা যায় না। তাহলে কি সেই সময় ও সেই অবস্থায় শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে পাগড়ী পরা মহৎ ফযীলতের কাজ? পাগড়ী পরা জায়েয কি-না? পাগড়ীর রং কিরূপ ও কত হাত লম্বা হওয়া উচিত? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দেবেন বলে আশা করি।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে পাগড়ী একটি উত্তম পোষাক। নবী (ছাঃ) তথা ছাহাবীগণ সাধারণ ভাবেই এই পাগড়ী ব্যবহার করেছেন বলে একাধিক ছহীহ হাদীছ থেকে জানা যায়। যেমন- *মুসলিম 'হজ্জ' অধ্যায়, হা/৪৫১-৪৫৪; বুখারী 'মাগাযী' অধ্যায়, হা/৪০৩৯।*

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ থেকে সাধারণ ভাবে পাগড়ী পরা জায়েয প্রমাণিত হচ্ছে এবং এ সকল হাদীছ থেকে এটিও প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিশেষ কোন ইবাদতে কিংবা অনুষ্ঠানেই শুধু পাগড়ী পরা নির্দিষ্ট নয়। বরং সর্বাবস্থায় পাগড়ী পরা যেতে পারে। প্রকৃত অর্থে অন্যান্য পোষাকের ন্যায় পাগড়ীও একটি পোষাক মাত্র। যা সকল স্তরের লোকের জন্য ব্যবহার যোগ্য।

ফলে বিশেষ কোন স্তরের লোকদের জন্য শুধু পাগড়ী পরা ফযীলতপূর্ণ মনে করা যেমন আদৌ ঠিক নয় তেমনি বিশেষ ইবাদতে, অনুষ্ঠানে কিংবা সময়ে পাগড়ী পরা ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ঠিক নয়। বরং ফযীলত মনে করে এরূপ পাগড়ী পরা বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিৎ। তবে ফারেগ হাফেয ছাত্রদের মাথায় যে পাগড়ী পরানো হয়, সম্ভবতঃ এটা তাদেরকে পুরষ্কার হিসাবে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে তাকে সুন্নাতের পাবন্দ হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রকাশ থাকে যে, যে কোন রঙের পাগড়ী পরা যায় তবে কালো পাগড়ী পরা উত্তম। পাগড়ীর দৈর্ঘ্য বিষয়ে ১ম বর্ষ ১০(৭৫) প্রশ্নোত্তর দেখুন।

প্রশ্ন (১৩/৯৩)ঃ বর্তমানে প্রচলিত আইনে যে খাজনার প্রচলন রয়েছ, তা কি জায়েয? না নাজায়েয? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোয্যাম্মেল হক
গ্রামঃ নিমতলা কাঁঠাল, পোঃ গোমস্তপুর
চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মুসলমানদের উপর প্রচলিত খাজনার আইন মানব সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় আইন মাত্র। এই আইন শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা দ্বীন ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করেছে। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর' (বাক্বারাহ ৪৩)। আর এই যাকাত সঞ্চিত মাল, ফল, ফসল সবকিছুর উপরেই ধার্য করা হয়েছে। ফলে উক্ত শারঈ বিধানের আলোকে সরকার যাকাত স্বরূপ মুসলমানদের নিছাবভুক্ত সব রকম সম্পদ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ সঞ্চয় করতে পরবে, যা দ্বারা সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এছাড়া শারীয়তে আরো একাধিক আয়ের উৎস রয়েছে। আর নফল ছাদকা তো রয়েছেই। তাতেও যদি না কুলায়, তবে সরকার বৈধ যরূরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের উপর স্থায়ী ভাবে খাজনা-ট্যাক্স আরোপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে।

প্রশ্ন (১৪/৯৪)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, লম্বা জামা পরা বিদ'আত। নবী (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে আমার সুন্নাতী জামা কেমন হওয়া উচিৎ। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

-লোকমান ও আব্দুল গাফফার
পোঃ সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে অপচয় ও অহংকার বিবর্জিত যে কোন প্রকার পোষাক পরিধান করা বিধি সম্মত। আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন, বান্দাদের জন্য সৃষ্ট আল্লাহ্র

http://islaminonesite.wordpress.com

সাজ-সজ্জা ও পবিত্র খাদ্যবস্তু সমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন! এসব নে'আমত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং ক্বিয়ামতের দিন খালেছ ভাবে তাদেরই জন্য' (আ'রাফ ৩২)।

মহানবী (ছাঃ) বলেন, পানাহার কর, পরিধান কর এবং ছাদকা কর। তবে অপচয় ও অহংকার বশতঃ নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যা চাও খাও ও যা চাও পরিধান কর। তবে এ বিষয়ে তোমাকে দু'টি ভুল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তা হ'ল- অপচয় ও অহংকার। *-বুখারী, 'লিবাস' অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ; মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায়, হা/৪৩৮০-৮১।* মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ স্বীয় পোষাক ঝুলাবে, তার দিকে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেন না' (ঐ)। অতএব জামা লম্বা-খাটো এখানে বিচার্য বিষয় নয়।

তবে পোষাকের ব্যাপারে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন- (১) পুরুষ হৌক নারী হৌক সকলেরই পোষাক যেন তাকওয়া সম্পন্ন হয়। তার মাধ্যমে যেন কোনরূপ বেহায়াপনা প্রকাশ না পায় (আ'রাফ ২৬)। (২) পোষাক যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং ময়লাযুক্ত ও নোংরা না হয় *(আ'রাফ ৩১, আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩৫১)*। (৩) পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র যেন রেশম থেকে তৈরী না হয়। কেননা মহানবী (ছাঃ) পুরুষকে রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরবে সে পরকালে পরবে না। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩২০-২১।* (৪) পুরুষের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলানো না হয়। যেমন- নবী (ছাঃ) বলেন, 'দুই টাখনুর নিচে যতটুকু কাপড় ঝুলবে, তা জাহান্নামে যাবে'। *-বুখারী, 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৪।* (৫) পুরুষ ও মহিলাদের পোষাক যেন পরস্পরের সদৃশ না হয়। কেননা মহানবী (ছাঃ) মহিলাদের পোষাক পরিধানকারী পুরুষের প্রতি লা'নত করেছেন। *-ফাৎহুল বারী 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৫।*

অন্য বর্ণনায় আরো রয়েছে মহানবী (ছাঃ) 'মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন। এমনকি তিনি এও বলেছেন, 'মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'। *-বুখারী, 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৬১।*

(৬) যেন অমুসলিমদের জাতীয় পোষাকের সদৃশ না হয়। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করল, সে তাদের মধ্যে গণ্য হ'ল। *-আবুদাঊদ, 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৪।* তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যদের (অমুসলিম) সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'। *-তিরমিযী, 'ইস্তিযান' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৭।*

(৭) এমন চিকন, আটো সাঁটো ও খাটো পোষাক পরা যাবে না, যা দ্বারা বেহায়াপনা প্রকাশ পায়। *-মুসলিম 'লিবাস' অধ্যায়; বুখারী 'ফিতান' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৬।*

উপরোক্ত বিধিনিষেধের সীমার মধ্যে থেকে প্রয়োজন মত খাটো, লম্বা যেকোন ধরনের পোষাক পরিধান করা জায়েয। তবে নবী (ছাঃ) -এর পোষাকের অনুকরণে সাদা, লম্বা ও ঢিলা-ঢালা পোষাক যে উত্তম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রশ্ন (১৫/৯৫)ঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য ফকীর-মিসকীন -কে খাওয়ানো যাবে কি? দলীল সহকারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আকমাল হোসাইন
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন দিন নির্ধারণ না করে এবং আনুষ্ঠানিকতা না করে মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য ছাদকা স্বরূপ ফকীর-মিসকীন -কে খাওয়ানো যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা একজন লোক এসে রাসূল (ছাঃ) -কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। কোন অছিয়ত করে জাননি। আমি মনে করছি তিনি কথা বলতে পারলে ছাদকা করতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে ছাদকা করলে তার জন্য নেকী হবে কি? নবী (ছাঃ) বললেন, হাঁ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭২।* উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তির নামে অর্থ দান করলে সে নেকীর হকদার হবে। মৃত ব্যক্তির নামে ছাদকা করা যায় আর ছাদকা ব্যাপক অর্থ বহন করে। ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানোও এর অন্তর্ভুক্ত। আজকাল মৃতব্যক্তির নামে জাকজমকের সাথে যে 'চল্লিশা' ও 'খানা'র অনুষ্ঠান হিন্দুদের 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের অনুকরণে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। ফকীর-মিসকীন খাওয়ানোর নামে এই সব 'খানা'র অনুষ্ঠান করা চলবে না। বরং তার চাইতে মৃতের নামে কোন স্থায়ী ছাদকা করা উচিত, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মৃতের জন্য নেকীর কারণ হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com